পর্যায়ক্রমে এক একটি উটে আরোহণ করতেন। এ জিহাদকে এ জন্যই ইতিহাসে "জাইশুল উস্‌রাহ্ বা অভাব গ্রস্ত সৈন্যদল" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ জিহাদের সময়টা ছিল ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংকটাপন্নের কারণ। যুদ্ধক্ষেত্র ছিল সুদূর তাবুকে এবং সময় ছিল অত্যাধিক গরম কাল। তদুপরি তখন মদীনায় খেজুর পাকার ছিল মওসুম। আর তখন ছিল মদীনাবাসীদের খেজুর তূলার মওসুম আর এ খেজুরের উপরই নির্ভরশীল ছিল তাঁরা। এ সময়ে খেজুর ঘরে তুলতে না পারলে তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে বছরের খোরাকী হারিয়ে মদীনাবাসী দারুন কষ্টে নিপতিত হওয়ার আশংকাও ছিল অধিক। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে জিহাদে যাওয়া এক কঠিন পরীক্ষার সমতুল্য ছিল।

একদিকে আল্লাহ্‌র ভয় অপরদিকে রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ এবং অপর দিকে সারা বছরের খোরাকী হারাবার আশংকা। এত সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে পড়েছিলেন। শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও মুনাফিক ব্যতীত সমস্ত মুসলমানই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা অপরিহার্য কারণ বশতঃ এবং যানবাহনের জন্য উট সংগ্রহ করতে না পারার দরুন এ জিহাদের অংশগ্রহণ করতে পারেননি আপেক্ষে তাঁরা ক্রন্দনরত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-দের নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যখন সামূদ জাতির বস্তিতে পৌছলেন, তখন তিনি চাঁদর দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে উট দ্রুত চালাতে লাগলেন এবং সাহাবী (রাঃ)-দেরকে বললেন, যালিমদের এ বস্তিটা ক্রন্দনরত অবস্থায় তাড়াতাড়ি অতিক্রম কর। এ বস্তিতে সামূদ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যে আযাব এসেছিল আল্লাহ্ না করুন, সে আযাব যেন তোমাদের উপরও আপতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) একটি অভিশপ্ত স্থান অতিক্রম করার সময় আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে নিজের চেহারা চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিজ সাহাবী (রাঃ)-দেরকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে এ স্থানটি অতিক্রম করতে আদেশ করলেন। আমাদের উপর কোনরূপ বালা-মুসিবত বা অপদ-বিপদ, যেমন- ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি উপস্থিত হলে আমরা আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য বন্যা কবলিত ও ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করতে যাই, আর কান্নাকাটি পরিবর্তে ভয় বা বিষাদের কোন কল্পনাও আমাদের মনে তখন উদয় হয়না।



## তাঁবুকের যুদ্ধে হযরত কা'ব (রাঃ)-এর অনুপস্থিতি ও তওবা

তাবুক যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন সময়টা ছিল অত্যাধিক গরমের। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগ লোক ব্যতীত প্রায় ৮০ জনের বেশি আনসার মুনাফিক এবং প্রায় সমান সংখ্যক বেদুইন তাছাড়া মদীনার বাইরের বড় এক দলের লোকও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাই লোকেরা অন্য লোকদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত রেখেছিল এবং এ বলে প্রচার করেছিল যে, এ প্রচন্ড গরমে এ যুদ্ধে বের হবে না," এরূপ প্রচারণাই প্রচার করে লোকদেরকে বাধা প্রদান করেছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও তীব্র থেকে তীব্রতর এবং গরম।" তাছাড়া আরও তিন জন খাঁটি মুসলমানও এ জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা কা'ব ইব্‌নে মালিক (রাঃ), হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্‌নে রাবী (রাঃ)। এ তিনজন সাহাবী (রাঃ) মোনাফেকী কিংবা কোন সঙ্গত কারণে নয় বরং আর্থিক স্বচ্ছলতাই এ জিহাদে শরীক না হওয়ার ছিল প্রধান কারণ। কা'ব (রাঃ)-এর নিজের বর্ণনা, আমি ভাবলাম বাগানে খেজুরের ফলন খুব ভাল হওয়ায় আমি যদি চলে যাই, তাহলে সব খেজুর বিনষ্ট হওয়ার আশাংকা দেখা দিবে। তাছাড়া আমি তো সব জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি এ জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে দোষের তেমন কিছুই হবে না, এরূপ চিন্তাই রয়ে গেলাম।

যখন যুদ্ধের পর তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হল তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে গোটা বাগানটিই আল্লাহ্‌র পথে দান করলেন এ চিন্তা করে, কেননা এ বাগানটি যুদ্ধে শরীক হতে তাঁকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। হযরত হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া (রাঃ)-এর পরিবারে কিছু লোক কোথাও যাওয়াতে ভাবলেন, আমি সব জিহাদেই শরীক হয়েছি শুধুমাত্র এ একটি জিহাদেই শরীক না হলে তাতে আর কি হবে? এটা ভেবে তিনি রয়ে গেলেন।

যুদ্ধের পর যখন বোধোদয় হল তখন সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার মনস্থ করলেন। কেননা এ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের কারণেই যুদ্ধে না যাওয়ার প্রধান মূল কারণ ছিল। হযরত কা'ব (রাঃ) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নিজেই আপন ক্রুটির কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন, তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে আমি আর কোন দিন এত স্বচ্ছল ও সুখী ছিলাম না। এ যুদ্ধের সময় আমার যত ধন-সম্পদ ছিল আর কোন কালেও তত ছিল না। রাসূল (সাঃ)-এর একটি যুদ্ধ

সংক্রান্ত নির্দেশ ছিল যে, কোথায় এবং কোন্‌দিকে যুদ্ধ হবে তা তিনি কখনও সুস্পষ্ট প্রকাশ করতেন না। যে দিকে যুদ্ধ তার বিপরীত দিকের খোঁজ খবরও নিতেন, কারণ কোন্‌ দিকে অভিযান চলবে তা নিশ্চিত বলা যেত না। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন। কারণ সময়টা ছিল প্রচন্ড গরমকাল আর যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল বহু দূরে আর শত্রুপক্ষও ছিল প্রবল শক্তিশালী। কাজেই যাত্রার পূর্বেই নিজ বাহিনীকে সর্ব বিষয়ে সুচারুরূপে প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে, এত অধিক মুসলমান জিহাদে প্রস্তুত হয়েছিলেন যে, তাঁদের তালিকা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। লোক এত অধিক ছিল কেউ অনুপস্থিত থাকলে তা অনুমান করা সম্ভবপর ছিল না। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি অতি সকালেই যুদ্ধে যাওয়ার সামানপত্র ঠিক করার মনস্থ করলাম যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে চলে যাব।

এরিমধ্যে রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-দেরকে নিয়ে তাঁবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়না হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার যাওয়া আর হল না। রাসূল (সাঃ) চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, দু'এক দিনের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে তাদের সাথী হব। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করতে করতে রাসূল (সাঃ) তাবুকের নিকটবর্তী হলেন, তথাপি আমার মনস্থির করা আর হল না। সব সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) চলে যাওয়ার পর মদীনার রাজপথে দেখলাম, আর কেউ সেখানে অবশিষ্ট নেই; শুধু দু'একটি মুনাফিক আর অক্ষম বৃদ্ধ ও শিশুরা ব্যতিত। রাসূল (সাঃ) তাঁবুকে পৌঁছে আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব কোথায়? তাঁকে দেখছি না? একজন সাহাবী (রাঃ) বললেন, তার ধন সম্পদ তাঁকে আটকে রেখেছে। এ কথা শুনে হযরত মায়ায (রাঃ) বললেন, 'মিথ্যা কথা, আমি যতটুকু জানি, সে ভাল লোক অর্থাৎ মুনাফিক নয়। কিন্তু রাসুল (সাঃ) এ কথার উপর নীরব রইলেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলমানগণ যখন বিজয় বেশে দলবলসহ ক্রমান্বয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন, এ সংবাদে তখন আমার দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। ভাবলাম কি কৈফিয়ত দিব রাসূল (সাঃ)-এর কাছে? দিন যতই অতিবাহিত হল আমার অনুশোচনা ও অশান্তি ক্রমাগত বাড়তে লাগল। মনে নানা আপত্তির কথা উদয় হতে লাগল। ভাবলাম, কোন একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর থেকে ক্ষমা চেয়ে নিব। আবার ভাবলাম, আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মিথ্যা বলব, তা কি করে সম্ভব? এ ব্যাপারে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে পরামর্শ করা অবস্থাতেই রাসূল (সাঃ) তাঁর বাহিনীসহ মদীনায় ফিরে এলেন। তখন আর কি করব অস্থিরচিত্তেই সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাসূল (সাঃ) অভ্যাসানুসারে তিনি



মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করেই দু'রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামায আদায় করে লোকদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে গেলেন। প্রথমে মুনাফিকরা এসে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে মিথ্যা আপত্তি পেশ করে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে নিজেদের জিহাদে যোগ না দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে লাগল। রাসূল (সাঃ) তাদের কথা শুনে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করলেন।

এমন সময় আমি হাযির হয়ে রাসূল (সাঃ)-কে সালাম করলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে একটু মুসকি হেসে মুখ ফিরায়ে নিলেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি মুনাফিক নই, আমার ঈমানও বিনষ্ট হয়নি। তখন তিনি বললেন, "এখানে এস।" কাছে গিয়ে বসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌ জিনিস তোমাকে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রেখেছে? আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল এ মুহূর্তে আমি যদি কোন দুনিয়াদার লোক হতাম; তাহলে যে কোন একটা মিথ্যা বলে আমার ক্রটির ক্ষমা চেয়ে নিতাম। কারণ, গুছিয়ে কথা বলার কৌশল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করেছেন। কিন্তু আজ যদি আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করি, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তায়ালা আমার প্রতি নারায হবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অচিরেই আল্লাহ্‌ আপনার ক্রোধকেই ঠান্ডা করে দিবেন। সুতরাং সত্য কথাই বলি, আল্লাহ্‌র কসম আমার তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার কোন আপত্তি ছিল না, বরং বর্তমানে আমি যেরূপ স্বচ্ছল এর পূর্বে আমি কখনও এরূপ স্বচ্ছল ছিলাম না। আমার কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি সত্য বলছ! এরপর তিনি আমাকে বললেন, এখন যাও, আল্লাহ্‌ তায়ালাই তোমার ফয়সালা করবেন।

আমি সেখান থেকে ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজনরা তিরষ্কার করতে লাগল। তারা বলল, এর পূর্বে তুমি কখনও কোন ভুল করনি, এটাই তোমার প্রথম ভুল। তুমি যদি কোন একটা কারণ পেশ করে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার মাগফিরাতের জন্য রাসূল (সাঃ)-কে দোয়া করার আবেদন করতে, তাহলে রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া তোমার মাগফিরাতের জন্যই যথেষ্ট ছিল। তখন আমি বললাম, আমার মত আরো কেহ আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ আরো দু'জন আছেন যাঁদের সাথেও রাসূল (সাঃ) এরূপই ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া (রাঃ) ও মুবারাহ ইব্‌নে রাবী। আমি দেখলাম, দু'জন ভাল লোক এবং উভয়ই বদরী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, কেহ এদের

সাথে কথা বলতে পারবে না। এটা নিয়মের কথাই, যার সাথে সম্পর্ক থাকে, শাসন তাকেই করা হয়, শাস্তি তাকে দেয়া হয়। যার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক নেই তাকে কেহ শাসন করে না, শাস্তিও দেয় না। রাসূল (সাঃ)-এর এ নির্দেশে সমস্ত সাহাবী আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে এবং আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এতে আমার মনে হল, বিশাল পৃথিবীটা যেন সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় একটি কথা ভেবে খুবই অস্থির হলাম যে, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে কেহ আমার জানাযা পড়বে না। আর আল্লাহ্ না করুন, যদি রাসূল (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত কেহ কথাও বলবে না আর আমার জানাযাও কেহ পড়বে না। কারণ, রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম অমান্য করার সাহস কে করবে? এভাবেই একমাস বিশ দিন অতিবাহিত হল আমার অপর দু'জন সাথী শুরু থেকেই ঘরের কোণে বসে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের তুলনায় শক্তিশালী ছিলাম। আমি আগের মতই বাইরে চলাফেরা করতাম। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তাম। কিন্তু কেহ আমার সাথে কোন কথা বলত না। আমি রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম করলে লক্ষ্য করতাম যে, সালামের উত্তরে রাসূল (সাঃ)-এর ঠোঁট মোবারক নড়ে কি-না। ফরয নামাযের পর সুন্নাত ও নফল নামাযগুলো রাসূল (সাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে আদায় করে আড় চোখে দেখতাম যে, তিনি (সাঃ) আমার দিকে তাকান কি-না। আমি নামায শুরু করলে তিনি আমার দিকে চাইতেন আর আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এমনি করেই আমার দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আমার সাথে কথা বন্ধ করার কারণে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

এ পরিস্থিতিতেই আমি একদিন হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর দেয়ালের উপর উঠে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ছিলেন আমার চাচাত ভাই এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? তিনি এরও কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি তাঁকে পুনরায় কসম দিয়ে উক্ত কথাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এবারও তিনি নিরোত্তর রইলেন। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন। তাঁর কথা শুনে আমার দু'চোখ বেয়ে ক্রামাগত অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল আর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। একদিন বাজারে যাওয়ার সময় দেখলাম এক খ্রীষ্টান কিবৃতী সিরিয়া থেকে মদীনায় শস্য বিক্রি



করতে এসে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করছে, আপনারা কেহ কা'ব ইব্নে মালেকের ঠিকানা জানেন কি? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে বললে সে আমার কাছে এসে গাস্সান গোত্রের কাদের বাদশাহ্র একটি চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। তাতে লেখা ছিল, জানতে পারলাম তোমার মনিব নাকি তোমার উপর যুলুম করছে। আল্লাহ্ তোমাকে অপমান ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। তুমি আমার কাছে চলে এস, আমি তোমাকে সাহায্য করব। পত্রটি পড়ে আমি "ইন্না লিল্লাহ্" পড়তে লাগলাম। কারণ আমার এত বড় অবনতি ঘটছিল যে, শেষ পর্যন্ত কাফেররাও লোভ দেখিয়ে আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিল। রাগে দুঃখে আমি পত্রটি একটি জলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন বলে আমার এতটুকু অবনতি ঘটেছে যে, কাফেররাও আমাকে প্রলুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করার আজ সাহস পাচ্ছে। রাসূল (সাঃ) আমার কথা শুনে কিছুই বললেন না। একান্ত বিমুখ ও মর্মাহত হয়ে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। এ মুহূর্তে মনে হল গোটা জগতটাই যেন আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার মানষিক অবস্থা যখন এরূপ, তখন এক দিন রাসূল (সাঃ)-এর কাসেদ এসে আমাকে বললেন, আমাকে স্ত্রী থেকেও পৃথক থাকতে হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কি? আমি কি তাঁকে তালাক দিয়ে দিব? কাসেদ বলল, 'না' শুধু স্ত্রী থেকে পৃথক থাকতে হবে এটাই নির্দেশ। আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা আমার ফয়সালা না করেন সে পর্যন্ত তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে। আমার অপর দুজন সাথীর প্রতিও অনুরূপ আদেশ হয়েছিল। হযরত হেলাল (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ, কেহ তাঁর খিদমত না করলে তিনি মারা যাবেন। আপনার হুকুম হলে আর আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমি তাঁর কিছু কাজকর্ম করে দিতে পারি? রাসূল (সাঃ) বললেন, ক্ষতি নেই, কিন্তু সহবাস করা নিষিদ্ধ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসবের দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। যেদিন থেকে এ অবস্থা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে তিনি শুধু ক্রন্দনরত অবস্থায়ই সময় অতিবাহিত করছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অনেকে আমাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, হেলালের ন্যায় তুমিও স্ত্রীর খিদমত গ্রহণের অনুমতি চাও, হয়ত পেয়ে যাবে। আমি বললাম, তিনি বৃদ্ধ আর আমি যুবক।

এভাবে আরও দশ দিন কেটে গেল এবং আমার এ অভিশপ্ত অবস্থায় ৫০টি দিন অতিক্রান্ত হল। সেদিন আমি ফযরের নামায বাড়ির ছাদেই আদায় করেছি। মন অতি চঞ্চল; হৃদয় অতিশয় বিষাদিত। এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে কে যেন উচ্চস্বরে বলল, "কা'ব সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এতটুকু শুনেই আমি সিজদায় পড়ে আনন্দের আতিশয্যে ক্রন্দন করতে লাগলাম। মনে হল, সমস্ত ভার-বোঝা যেন নেমে গেছে। এ মুহূর্তে যেন সমস্ত সংকীর্ণতা শেষ হয়ে পৃথিবীটা প্রশস্ত বোধ হতে লাগল। সেদিন ফযরের নামাযের পরই রাসূল (সাঃ) আমার ক্ষমা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে পাহাড়ের উপর উঠে আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরপর অপর একজন সাহাবী (রাঃ) ঘোড়ার পিঠে ছুটে এসে আমাকে এ সংসংবাদ দিয়েছিলেন।

আমি তৎক্ষণাত আমার পরিধানে যে পোশাকটি ছিল তা সংবাদ বাহককে পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র কসম এ পোশাক ব্যতীত আমার কাছে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। ফলে; বাড়ির লোকদের কাছ থেকে একটি কাপড় ধার করে এনে লজ্জা নিবারণ করে অনতিবিলম্বে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। এভাবে আমার সঙ্গীদ্বয়কেও লোকেরা সুসংবাদ দিলেন। তাঁরাও সে দিনই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেন। আমি যখন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলাম, তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগলেন। সবার আগে হযরত তালহা (রাঃ) ছুটে এসে আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করলেন যা আমার চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরপর আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে সালাম করলাম। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দের সময় তাঁর মুখমন্ডল এরূপ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তওবার পরিপূর্ণতা হল, আমার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে দিলাম। কেননা, এগুলোই আমার উপর এ কঠিন বিপদ ও লাঞ্ছনার কারণ ছিল। তিনি (সাঃ) বললেন, এরূপ করলে তোমার কষ্ট হবে, কাজেই কিছু সম্পদ তোমার কাছে রেখে দাও, বাকীটা দান কর। আমি বললাম, যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে খয়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালটুকু রেখে দেই। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, সত্য কথা বলাটাই সেদিন আমাকে নাযাত দিয়েছে। এ ছিল সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-গণের আল্লাহ্‌র ভয়ের দৃষ্টান্ত। তাঁরা সর্বদাই জিহাদে যোগ দিয়েছেন, মাত্র একবার



শরীক না হওয়ার দরুন কি কঠোর শাস্তিটা না হয়েছিল, আর তাঁরা কত সহিষ্ণুতার সাথে তা মাথা পেতে নিয়েছিলেন। নিজের ত্রুটির জন্য সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অবিরত কেঁদেছেন। যে সম্পদ জিহাদে যোগদানে বাধা সৃষ্টি করেছিল সেগুলো আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিলেন। বিধর্মীর লোভ প্রদর্শনে হযরত কা'ব (রাঃ) আরও কত বেশি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর ঈমান কত দুর্বল হয়েছে যে, কাফেররা পর্যন্ত তাঁকে প্রলোভন দেখাতে সাহস পাচ্ছে। তাই তাঁর অনুশোচনার মাত্রায় বেড়ে গেল। তিনি তাঁর এ অবনতির কথা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করলেন না।

আমাদের সামনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ রয়েছে। অন্যান্য সব বাদ দিয়ে শুধু নামাযের কথাই ধরা যাক; আমাদের কয়জন এ হুকুমটি যথাযথভাবে পালন করেছি? অথচ এ নামাযই হল আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। যা পালন করলে মুমিন হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, পালন না করলে কাফেরের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়। তারপর যাকাত ও হজ্বের কথা তো অনেক দূরে, কেননা সেগুলো আদায় করতে সম্পদও ব্যয় করতে হয়।

## কবরের ফরিয়াদ

হযরত রাসূল (সাঃ) একদিন মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখতে পেলেন, কয়েকজন সাহাবা (রাঃ) অট্টহাসিতে মশগুল রয়েছেন এবং তাঁদের হাসির নমুনা এরূপই ছিল যে তাঁদের দাঁত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। রাসূল (সাঃ) এঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, যদি তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে, তাহলে আমি কখনও এ ঘৃণ্য অবস্থায় তোমাদেরকে দেখতাম না। সুতরাং তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন কবর এ বলে ফরিয়াদ না করে যে, আমি মাটির ঘর, নির্জন ঘর, অপরিচিত ঘর, পোকা মাকড়ের ঘর। যখন নেককার কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় তখন কবর তাকে এ বলে সম্বোধন করতে থাকে, তোমাকে খোশ আমমেদ বা স্বাগতম, যত লোক পৃথিবীতে বিচরণ করত, তারি মধ্যে তুমিই আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যখন আজ আমার কাছে এসেছ, নিশ্চয় আমার সদ্ব্যবহার পাবে। অতঃপর উক্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে জান্নাতের একটি দরজা এ কবরের দিকে খুলে দেয়া হলে জান্নাতি সুগন্ধি কবরের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। কোন পাপীকে যখন কবরস্থ করা হয়, তখন কবর তাকে বলতে থাকে, হে পাপীষ্ট! তোর কবরে আগমন বড়ই অশুভ! দুনিয়ার সমস্ত লোকদের

মধ্যে তুই আমার কাছে ছিলে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার পাত্র। আজ তোকে যখন আমার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, তখন তুই আমার ব্যবহার এবং আচার-আচরণ কিরূপ তা দেখতে পাবি। অতঃপর কবর দু'দিক থেকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, পাপীষ্ঠের পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপর দিকে ঢুকে যাবে আর ৭০টি বিষধর অজগর আযাবের জন্য নিযুক্ত করা হবে। সেগুলো এত ভয়ংকর ও বিষাক্ত যে, এ সাপ যদি পৃথিবীতে একটি নিশ্বাসও ফেলে, তাহলে বিষের ক্রিয়ায় যমিনে কোন তৃণলতা জন্মাবে না। অনবরত সাপগুলো দংশন করতে থাকবে। কবরবাসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ)- বলেন, কবর হয়ত জান্নাতের একটা টুকরা, নতুবা জাহান্নামের একটা গর্ত। (মিশকাত)

এ জন্যই রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। মৃত্যুকে স্মরণ করলে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) মৃত্যুকে অধিক পরিমাপে স্মরণ করতে আমাদেরকে অসিয়ত করেছেন।

## হযরত হানযালা ( রাঃ)-অন্তরে মোনাফেকীর ভয়

হযরত হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার আমরা মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে নানান বিষয়ে নসীহত করছিলেন, তাতে আমাদের মন পরিবর্তনে অশ্রু বইতে লাগল। মজলিস শেষে আমি যখন বাড়ি ফিরে বিবি-বাচ্চারা কাছে এসে দুনিয়ার কথাবার্তা বলতে লাগলাম তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলাম, তাতে আমার অন্তরের পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। হঠাৎ আমার মনে হল, আমি একটু আগে কেমন ছিলাম আর এখন কেমন হয়ে গেলাম। তখন আমার অন্তর বলে উঠল, হানযালা! তুমি তো মুনাফিক হয়েছ। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর মুহব্বতে কিছু আগে থাকা কালে তোমার অবস্থা ছিল এক রকম, আর বাড়ি আসার পর তোমার অবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার এ অবস্থার পরিবর্তনে আফসোস ও আক্ষেপ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আসতে দেখে আমি তাঁকে বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সোবহান্নাল্লাহ" তুমি কি বলছ? আমি তাঁকে তখন সব ঘটনা খুলে বললাম যে, যখন আমরা নবীজীর খিদমতে থাকি, সেখানে ভাসমান অবস্থায় যখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনি, তখন এগুলো যেন আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমরা ঘরে ফিরে আসি এবং পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হই তখনও আর এসব মনে



থাকে না। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের নেশায় সব কিছু ভুলেই যাই। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, এরূপ অবস্থা তো আমারও হয়।

অতঃপর আমরা উভয়েই রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)। হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তখন হযরত হানযালা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আমরা যখন আপনার খিদমতে উপস্থিত থাকি, আপনার মুখে জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনি, তখন আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, আমরা জান্নাত-জাহান্নাম যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার মজলিস থেকে বাড়ি ফিরে সাংসারিক বিভিন্ন কাজে নিমগ্ন হই, তখন আমাদের এ অবস্থা আর এরূপ থাকে না, সব কিছুই ভুলে যাই। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি ঐ আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, সব সময় যদি তোমাদের ঐ অবস্থা বিদ্যমান থাকত যেরূপ আমার সামনে হয়, তাহলে ফেরেস্তারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। হে হানযালা! জেনে রাখ, মানুষের এরূপ অবস্থা কখনও কখনও হয়ে থাকে। মানুষের সাথে মানুষের প্রয়োজনসমূহ লেগেই রয়েছে, যেগুলো পুরণ করতে মানুষ বাধ্য। যেমন, খাওয়া-পরা, সন্তানাদির খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। তাই উপরোক্ত অবস্থা মানুষের কখনও কখনও হাসিল হতে পারে। সর্বদাই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকা অবশ্যই ক্ষতিকর। ফেরেশ্‌তারা এসব থেকে মুক্ত; কাজেই ফেরেশ্‌তাদের ন্যায় অবস্থা সব সময় মানুষের হতে পারে না। তবে চিন্তার বিষয় হল এ যে, সাহাবায়ে কিরামের দ্বীন দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা কেমন ছিল তা হযরত হানযালা (রাঃ)-এর চিন্তা চেতনা সম্পর্কে ধারণা করলেই উপলব্ধী করা যাবে।

## আল্লাহ্‌ভীতির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

কুরআন, হাদীস ও বুজুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌ভীতির কথা এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে; সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহ্ ভীতির এবং দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা আনয়ন করে মানব জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর করে তোলাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র ভয় সমস্ত জ্ঞান ও হিকমতের মূল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র ভয়ে এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, অবশেষে তাঁর দু'টি চোখই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে

ক্রন্দন করতে দেখে আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমার কান্নায় আশ্চর্য বোধ করছ? অথচ আল্লাহ্‌র ভয়ে সূর্য, চন্দ্রও কাঁদে। একবার রাসূল (সাঃ) এক যুবক সাহাবী (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকটি তখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন– যুবক যখন فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان এ আয়াতে পৌঁছল, তখন ভয়ে তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি বলছিলেন, হায়! আমার দুর্ভাগ্য যেদিন আকাশ ফেটে যাবে, সে ক্বিয়ামতের দিন আমার কি দশা হবে, হায়! রাসূল (সাঃ) শুনে তাঁকে বললেন, তোমার কান্নায় ফেরশতারাও অংশগ্রহণ করছে এবং কাঁদছে। একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে খুব কেঁদে বলেছিলেন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌ তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, "তুমি আজ ফেরেশ্‌তাদেরকে কাঁদিয়ে ফেলছ। আবদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা (রাঃ) একদিন খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। তাঁর কান্না দেখে তাঁর স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" স্ত্রী বললেন, যে কারণে আপনি কাঁদছেন। তিনি বললেন, আমি এ জন্য কাঁদছি যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে তো আমাদের যেতেই হবে। জানি না তখন সে পথ অতিক্রম করতে পারব কিনা। যুরারাহ ইব্‌নে আওফা (রাঃ) একটি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ক্বিরাতের মধ্যে فاذا نقر فى الناقور (যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে) পর্যন্ত পৌঁছে, আয়াতটি পাঠ করার সাথে সাথে বেহুস হয়ে ইন্তিকাল করলেন। হযরত খোলায়েদ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) একদিন নামায পড়ছিলেন। ক্বিরাতের মধ্যে যখন كل نفس ذائقة الموت (প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে) এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আয়াতটি তিনি বারবার পড়তে লাগলেন। খানিকক্ষণ পর ঘরের এক কোণ থেকে আওয়াজ এল তুমি এটা আর কত বার পড়বে? তোমার বারবার পড়ার দরুণ এ যাবত চারজন জ্বীন মরে গেছে। জনৈক সাহাবী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নামাযের মধ্যে যখন وردوا الى الله مولهم الحق এ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন তিনি এক চিৎকার মেরে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফোযায়েল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয় যাবতীয় নেক কর্মের দিকে নির্দেশ করে। হযরত শিবলী (রহঃ)-এর কথা



কে না জানে তিনি বলেন, আমি যখনই আল্লাহ্‌কে ভয় করেছি, তখনই আমার ইলম ও হিকমতের এমন দ্বার খুলে গিয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনও খোলেনি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার উপর দু'টি ভয় একত্রে দেই না এবং একই সময়ে দু'টি বিষয়ে নিশ্চিন্ত করি না। বান্দা যদি দুনিয়াতে আমার বিষয়ে উদাসীন থাকে, তাহলে আখিরাতে আমি তাকে ভয়ের সম্মুখীন করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করতে থাকে, তাহলে আখিরাতে তাকে নিশ্চিন্ত রাখব। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনকে ভয় করে, প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় প্রদর্শন করে। ইয়াহইয়া ইব্‌নে মোয়ায (রাঃ) বলেন, হতভাগা মানুষ যদি জাহান্নামকে এতটুকু ভয় করত যতটুকু দারিদ্রকে ভয় করে, তাহলে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করত।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বের হয়ে যায়, সে ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখ থেকে মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু নির্গত হয় সে চোখের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। তিনি (সাঃ) আরও বলেন, 'যে মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে উঠে, তার গুনাহসমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে যায়।' আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে তার জাহান্নামে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব যেমন স্তনের মধ্যে দিয়ে দুধ ফিরে যাওয়া অসম্ভব।' হযরত উক্‌বা ইব্‌নে আমের (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "নাযাতের উপায় কি?" উত্তরে তিনি (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'আপন জিহ্বাকে সংযত রাখ, ঘরে বসে থাক এবং নিজের গুনাহের জন্য অনবরত ক্রন্দন করতে থাক।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও আছে কি, যে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে?' তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আছে। 'যে ব্যক্তি নিজের গুনাহর ভয়ে সর্বদাই কাঁদে।' রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'দু'টি ফোঁটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়। একটি, অশ্রু যা আল্লাহ্‌র ভয়ে নির্গত হয় আর অপরটি ঐ রক্তের ফোঁটা যা জিহাদে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রবাহিত হয়।' রাসূল (সাঃ) আরও ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে আপন ছায়া দান করবেন, তন্মধ্যে এক শ্রেণী হল, যাঁরা নির্জনে বসে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে। যদ্দরুণ তাদের দু'চোখ বয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, 'যার কান্না আসে, সে কাঁদবে আর যার কান্না না আসে, সে কান্নার ভান করবে।' হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুনকাদির (রাঃ) যখন ক্রন্দন করতেন তখন

চোখের পানি দ্বারা তাঁর মুখ ও দাড়ি ভিজে যেত। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে স্থানে অশ্রু প্রবাহিত হয়, জাহান্নামের আগুন উক্ত স্থানকে স্পর্শ করবে না। হযরত সাবেত কেনানী (রহঃ)-এর চোখে ব্যথা হল, চিকিৎসক তাঁকে বললেন, একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলে চক্ষু ভাল হতে পারে। বিষয়টি হল, "তুমি কাঁদবে না। তিনি বললেন, যে চোখ কাঁদে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" হযরত ইয়াজিদ ইব্নে মাইসারা (রহঃ) বলেন, সাতটি কারণে মানুষের কান্না আসে। খুশীতে, ব্যথায়, ক্ষিপ্ততায়, হতবুদ্ধিতায়, দেখাদেখি, নেশায় ও আল্লাহ্র ভয়ে। আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত এক ফোঁটা অশ্রু, আগুনের কুন্ডলীকে নিভিয়ে দিতে পারে।

হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আমি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, আমি যদি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদি আর অশ্রু আমার গাল বয়ে প্রবাহিত হয়, তা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় সদকা করার চেয়েও অধিক প্রিয়।" রাসূল (সাঃ)-এর বহু হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিজের গুনাহর কথা ভেবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। তাই, নির্জনে বসে চোখের পানি ফেলাই অত্যন্ত কল্যাণকর এবং ফলপ্রসূ। নিজের গুনাহর ভয়ের সাথে সাথে আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহের আশা করাও আবশ্যক। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্র রহমত প্রতিটি বস্তুর জন্য ব্যাপক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন লোক ব্যতীত সমস্ত হাশরবাসী জাহান্নামে যাবে, তাহলে আল্লাহ্র রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আমি আশাবাদী যে, সে লোকটি আমিই হব। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন লোক ব্যতীত সমস্ত হাশরবাসী জান্নাতে যাবে, তাহলে আমার আমলের বিবেচনায় আমার ভয় হচ্ছে যে, সে লোকটি আমিই হব। কাজেই আল্লাহ্র ভয় ও আল্লাহ্র রহমত দু'টি বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা উচিত। বিশেষভাবে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র রহমতের আশা করাটাই অধিক বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আল্লাহ্র রহমতের আশা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।" হযরত আহমদ ইব্নে হাম্বল (রহঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় সন্নিকট হল, তখন তিনি নিজের ছেলেকে ডেকে বললেন, যেসব হাদীসে আল্লাহ্র রহমতের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আমাকে শুনাও। যাতে আমার প্রতি আল্লাহ্র রহমতের আশা বৃদ্ধি পায়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## সাহাবায়ে কিরামের পরহেযগারী ও দারিদ্র

দারিদ্রতা স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তাই তিনি দরিদ্র জীবন যাপন অবলম্বন করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, দারিদ্রতা মুমিনের তোহফা। তিনি (সাঃ) আরও ইরশাদ করেন, দারিদ্র আমার গৌরবের বস্তু।

## পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ আমার জন্য মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমি বললাম, হে আমার রব! আমি এটাই পছন্দ করি যে, একদিন পেট ভরে খাব আর একদিন উপবাস থাকব। ক্ষুধার্ত থেকে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন পেট ভরে খাব, তখন তোমার শুকরিয়া আদায় করে তোমার প্রশংসা করব। (তিরমিযী) আমরা যাঁর উম্মত বলে দাবী করি, যিনি শ্রেষ্ঠ নবী, দু'জাহানের পরিত্রাণকারী, তিনি দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করাই ভালবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি আমল আমাদের জন্য একান্তভাবেই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

## রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শপথ

পারিবারিক ব্যাপারে একবার রাসূল (সাঃ) স্ত্রীগণের আচার-আচরণে বিরক্ত হয়ে কসম করলেন যে, তিনি একমাস তাঁদের কাছে যাবেন না। এরপর থেকে একটি পৃথক ঘরে থাকতে লাগলেন। আর তাতে প্রচারিত হল যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর সমস্ত বিবিকে তালাক দিয়েছেন। সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর (রাঃ) দৌড়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সাহাবা (রাঃ)-গণ এখানে সেখানে বসে ক্রন্দন করছেন। আর বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসে কাঁদছেন। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যা হযরত হাফসাহ (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এখন কাঁদছ কেন? আগেই তো বলেছিলাম যে, এমন কথা বা আচার-আচরণ কখনো করবেনা, যে আচার-আচরণে রাসূল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর তিনি মসজিদে গেলেন। সেখানে দেখলেন একদল সাহাবী মিম্বরের পাশে বসে কাঁদছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলেন। কিন্তু অধিক অস্থিরতার

কারণে দীর্ঘ সময় বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। সেখান থেকে উঠে তিনি রাসূল (সাঃ) যেখানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর কাছে চলে গেলেন। সে ঘরের দরজায় রাবাহ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) পাহরাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঘরের দরজার সিঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত রাবহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত রাবাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর আগমনের কথা জানালে তিনি (সাঃ) চুপ থাকলেন, কোন কথাই বললেন না। হযরত রাবাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আমি আপনার কথা রাসূল (সাঃ)-কে বলেছি- কিন্তু তিনি কোন কথাই বলেননি।

হযরত ওমর (রাঃ) সেখান থেকে ফিরে এসে মিম্বরের কাছে বসে রইলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে পুনরায় হাযির হয়ে হযরত রাবাহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশের আব্রো অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কোন জওয়াব নেই। রাসূল (সাঃ) এবারও চুপ থাকলেন। এদিকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অস্থিরতাও চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হল। তৃতীয় বার চেষ্টা করেও কোন ফল না পেয়ে তিনি যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত রাবাহ (রাঃ) তাঁকে পিছন থেকে ডেকে বললেন, আপনাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে গিয়ে দেখলেন, রাসূল (সাঃ) একটি খেজুর পাতার মাদুরের উপর শুয়ে রয়েছেন। মাদুরের উপর কোনরূপ বিছানা না থাকায় পবিত্র দেহের উপর মাদুরের দাগ পড়ে গিয়েছে। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালের চামড়ার বালিশ। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সালাম করে প্রথমেই এ কথা জিজ্ঞেস করলাম যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি আপনার বিবিদের তালাক দিয়েছেন? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, "না"। আমি রাসূল (সাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার জন্য আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোরাইশ বংশের লোকদের, নারীদের উপর আমাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানের নারীরা পুরুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ পরিবেশে এদের সাথে মেলামেশা করে কোরাইশী নারীরাও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এরপর আমি আরও দু' একটি কথা বললাম, যার দ্বারা পবিত্র চেহারা মোবারকে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ঘরের চারদিক লক্ষ্য করে দেখলাম এক কোণে তিনটা কাঁচা চামড়া পড়ে আছে, আর





এক কোণে এক মুষ্টি যব পড়ে রয়েছে। এছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। এ ছিল ঘরের সমুদয় সম্পদ। তা দেখে আমি কেঁদে ফেললে রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন কাঁদব না? আপনার পবিত্র দেহ মোবরকে মাদুরের দাগ পড়ে আছে, আর আপনার যাবতীয় সম্পদ তো আমার সামনেই বিদ্যমান।

অতঃপর আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলা আপনার উম্মতকেও যেন আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করেন। রোম ও পারস্যের বাদশাহরা কত জাঁকজমক, কত বিলাসিতা, কত প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। অথচ তারা বেদ্বীন, আল্লাহ্‌র কোন ইবাদত করে না। পক্ষান্তরে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বিশেষ প্রিয় বান্দা। তা সত্ত্বেও এ দুর্দশা। তিনি (সাঃ) বালিশে মাথা রেখে শোয়া অবস্থায় ছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এর কথা শুনে উঠে বললেন, ওমর তুমি কি এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? শোন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ শুধুমাত্র দুনিয়াদারদের জন্য দেয়া হয়েছে আর আমাদের জন্য আখিরাতে। হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করুন। বাস্তবিকই আমি ভুলের মধ্যে নিপতিত রয়েছি। এ হল দু'জাহানের পরিত্রাণকারী, আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় রাসূলের জীবন যাপনের নমুনা। যিনি কোন বিছানা ছাড়াই খালি মাদুরে আরাম করলেন, গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেল, ঘরের মাল ও আসবাব-পত্রের অবস্থাও ইতিপূর্বে আমরা জানতে পারলাম। এ পরিস্থিতিতে অবস্থার উন্নতির জন্য হযরত ওমর (রাঃ) দোয়ার আবেদন করলে, তাঁকে কঠোর সতর্কবাণী শোনানো হল। হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, একটি চামড়ার তোষক ছিল, যার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল যে, আপনার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, একটি চট দু ভাঁজ করে বিছানো হত। একদিন আমার খেয়াল হল যে, চটখানি যদি চার ভাঁজ করে বিছানো হয় তাহলে একটু নরম হবে। আমি তাই করলাম। ভোরে ঘুম থেকে জেগে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আমার নিচে কি বিছানো হয়েছিল? আমি আরয করলাম, নতুন কিছু নয়, ঐ পুরাতন চটখানি আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, বিছানাটি পূর্বে যেভাবে

ছিল, সেভাবেই বিছিয়ে দাও। এরূপ নরম বিছানা রাতে জাগ্রত হতে বাধা সৃষ্টি করে। এখন আমরা আমাদের নরম নরম বিছানার প্রতি একটু লক্ষ্য করি। তাহলে বুঝে আসবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কতটুকু প্রাচুর্য দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে সর্বদা অভাব অভিযোগের কথাই আমাদের মুখে আহরহ আলোচনা হচ্ছে।

## হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ক্ষুধার দৃষ্টান্ত

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন আমার সেদিনগুলোর কথাও এখনো মনে আছে, যখন আমি ক্ষুধার তাড়নায় বেহুশ হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর মিম্বার ও হুজরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। আর লোকেরা উম্মাদ মনে করে আমার ঘাড়ে পা দ্বারা মর্দন করে দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি উম্মাদ ছিলাম না বরং তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যেত। রাসূল (সাঃ) ওফাতের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করলেন, তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। তাঁর কাছে একটি থলে ছিল যার মধ্যে খেজুরের বিচি ভর্তি ছিল। এ খেজুরের বিচি দিয়েই তিনি তাসবীহ্ পাঠ করতেন। যখন থলেটি খালি হয়ে যেত তখন তাঁর দাসী থলেটি পুনরায় ভরে দিত। তিনি সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য রাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন, এ নিয়মে তিনি নিজে, স্ত্রী ও খাদেম এ তিন জনে মিলে রাতের এক এক ভাগে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবেই সারারাত তাঁর বাড়িতে ইবাদত-বন্দেগী চলত।

## বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভাতা

কাপড়ের ব্যবসা করে হযরত আবু বকর (রাঃ) জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হওয়ার পরও পূর্বের ন্যায় তিনি কয়েকটি চাদর হাতে নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, বাজারে যাচ্ছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ব্যবসায় নিমগ্ন থাকলে খিলাফতের কাজ চলবে কি করে? তিনি বললেন, ব্যবসা না করলে স্ত্রী-সন্তানাদি চলবে কি করে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, চলুন, আবু ওবায়দার কাছে যাই। তাঁকে রাসূল (সাঃ) বায়তুল মালের খাজাঞ্চী নিযুক্ত করে গেছেন। তিনি আপনার



জন্য একটা ভাতা নির্দিষ্ট করে দিবেন। এরপর, উভয়ে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। তিনি একজন সাধারণের জন্য যে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন সে পরিমাণ ভাতা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যও নির্দিষ্ট করে দিলেন বেশিও নয়, কমও নয়।

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রী বললেন, মিষ্টান্ন জাতীয় কোন বস্তু খেতে খুব মন চাচ্ছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, মিষ্টি ক্রয় করার মত অর্থ আমার হাতে নেই, কি দিয়ে মিষ্টি ক্রয় করব? বিবি বললেন, আমি প্রতিদিনের খরচ থেকে কিছু অর্থ রেখে দিব এবং তা দিয়ে মিষ্টি খরিদ করব। তিনি অনুমতি দিলেন। কয়েক দিন পর কিছু অর্থ জমা হল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, অভিজ্ঞতায় জানা গেল যে, এ পরিমাণ অর্থ আমি বায়তুল মাল থেকে অতিরিক্ত নিয়ে থাকি। তারপর তিনি সঞ্চিত অর্থগুলো বায়তুলমালে পুনরায় জমা করে দিয়ে ভবিষ্যতে এ পরিমাণ ভাতা কম করে দিলেন এবং খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি মাসে এ পরিমাণ টাকা যেন কম দেয়া হয়।

এ হল খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা, যিনি রাসূল (সাঃ)-এর পর মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, আমি একজন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু খলীফা হওয়ার দরুন আমাকে রাষ্ট্রীয় কাজে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। তাই ব্যবসা পরিত্যাগ করে বায়তুল মাল থেকে ভাতা নিচ্ছি। মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমার প্রয়োজনার্থে বায়তুলমালে যা কিছু আছে, আমার পরে এসব জিনিস পরবর্তী খলীফার কাছে জমা করে দিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে কোন সম্পদ ছিল না, মাত্র একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, কটি পিয়ালা এবং একজন খাদেম ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, একটা ওড়না ও একটা বিছানাও ছিল। এসব জিনিস যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পাঠানো হল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা হযতর আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি রহমত করুন। তিনি পরবর্তী খলীফাদের এ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

## বায়তুল মাল থেকে হযরত ওমর (রঃ)-এর ভাতা

হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসায়ী ছিলেন বিধায় ব্যবসার মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর জন্যও বায়তুলমাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করা হল। একদিন তিনি মদীনাবাসীকে ডেকে বললেন, আমি ব্যবসায়ী ছিলাম এখন তোমরা আমাকে খিলাফতের কাজে নিযুক্ত করেছ। কাজেই এখন থেকে আমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি? লোকেরা বিভিন্ন ধরনের ভাতার কথা আলোচনা করলেন। হযরত আলী (রাঃ) চুপ করে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, মধ্যম ধরনের ভাতা যা তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর প্রস্তাব খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন আর মধ্যম ধরনের ভাতাই তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হল।

কিছুদিন পর হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী (রাঃ)-গণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাতা আরও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কেহই সাহস করে বলতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পিতার ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে যেন তাঁদের নাম প্রকাশ করা না হয়। হযরত হাফসা (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি এ প্রস্তাব কে করেছে নাম জিজ্ঞেস করলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, প্রথমে আপনার অভিমত জানতে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি লোকটির নাম জানতে পারতাম, তাহলে এমন শাস্তি দিতাম যে, তার চেহারা বিগড়ে যেত। তারপর বললেন, হাফসা! তুমিই বল, তোমার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর উৎকৃষ্টতম পোশাক কি ছিল ? তিনি উত্তর করলেন, দু'টি কাপড় ছিল। যা তিনি জুমার দিন এবং কোন বিদেশী প্রতিনিধি দল আসলে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ) তোমার ঘরে সবচাইতে উত্তম খাদ্য কি খেয়েছেন ? হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, আমরা যবের রুটি খেতাম। আমি গরম রুটির উপর একটু ঘি ঢেলে দিতাম আর তিনি (সাঃ) তাই আনন্দের সাথে খেতেন এবং অন্যকেও খাওয়াতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর সর্বোত্তম বিছানা কিরূপ ছিল? উত্তর



দিলেন, একটা মোটা কাপড়, গরমের সময় আমি তা দু'ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম আর শীতের সময় এর অর্ধেক বিছিয়ে দিতাম এবং বাকি অর্ধেক তিনি গায়ে দিতেন।

এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হাফসা ! তুমি এসব লোকদের জানিয়ে দাও, রাসূল (সাঃ) আখিরাতের সুখের আশায় দুনিয়াতে অল্পতেই পরিতুষ্ট হয়ে জীবন যাপন করেছেন আর আমি তাঁরই অনুসরণ করব। আমি রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এ দুজন সাথীর মতই জীবন-যাপন করব। আমি আর আমার দুজন সাথী অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) ও আবু বকরের উদাহরণ ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যাঁরা একই পথের পথিক। তন্মোধ্যে প্রথম ব্যক্তি একটি মাত্র পাথেয় নিয়ে চলেছেন আর গন্তব্যস্থলে পৌছে গেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছেন। সেও প্রথম ব্যক্তির কাছে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি পথ চলতে শুরু করেছে। এখন সে যদি পূর্বের দু ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাহলে সেও গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবে এবং তাঁদের সাথে মিলিত হতে পারবে নতুবা কখনও তাঁদের সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না। এটা ঐ ব্যক্তির অবস্থা, দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহগণও যার ভয়ে প্রকম্পিত হত তিনি কত সাধারণভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) খোতবা দিচ্ছিলেন, তাঁর পরিহিত কাপড়ে বারটি তালি ছিল, তন্মোধ্যে একটি ছিল চামড়ার তালি। একবার তিনি জুমার নামায পড়ানোর জন্য ঘর থেকে বের হতে বিলম্ব হল। মসজিদে পৌছে তিনি বললেন, আমার এ কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নেই, কাপড়খানি ধোয়ার পর শুকাতে একটু দেরী হয়ে গেছে। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আহার করছিলেন। এমন সময় ক্রীতদাস এসে সংবাদ দিল যে, উত্‌বা ইব্‌নে আবি ফারকাদ আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন।

তিনি ওত্‌বাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে খানায় শরীক হওয়ার জন্য বললেন। হযরত ওত্‌বা (রাঃ) খানা খেতে বসলেন। খাদ্য এত মোটা ছিল যে, তা খাওয়া যাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, আটা চালনী দিয়ে ছেঁকেও তো রুটি তৈরী করা যেত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সব মুসলমানেরই কি ময়দার রুটি খাওয়ার সঙ্গতি আছে? তিনি বললেন, সব মুসলমান তো খেতে পারবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আফসোস ! তুমি চাও যে, আমি

আমার সমস্ত স্বাদের বস্তু দুনিয়াতেই খেয়ে শেষ করে ফেলি। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী (রাঃ)-দের রয়েছে। এ যুগে তাঁদের পূর্ণ অনুসরণ সম্ভবও নয় আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এরূপ চেষ্টা করাও অনুচিত। কারণ, আমরা দুর্বল। এত অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই বর্তমান যুগের হক্কানী পীর মাশায়েখগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এত কঠোর সাধনার অনুমতি দেন না, যার দরুন দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, আমরা তো আগে থেকেই দুর্বল। এসব সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা শক্তিও দান করেছিলেন। তবে হ্যাঁ! তাঁদের অনুসরণের আকাংখা করা এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য যাতে বিলাসিতার মাত্রা কিছুটা কমে আসে, দুঃখ-কষ্টের সময় সব্র করা সহজ হয় এবং বিত্তশালী ও অর্থহীনের মধ্যে কিছুটা সমতা ফিরে আসে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, কিভাবে তার মত হওয়া যায়। সর্বদা একটি আক্ষেপ থাকে যে, হায় ! আমি কি হলাম, আমার থেকে তো অমুক ব্যক্তি অনেক বেশি অর্থ-সম্পদের অধিকারী।

## হযরত বেলাল (রাঃ) কর্তৃক জনৈক মুশরিক থেকে ঋণ গ্রহণ

এক ব্যক্তি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কোন অর্থ-সম্পদ জমা থাকত না। খরচ নির্বাহের দায়িত্ব আমার উপর ছিল ন্যাস্ত। রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কোন মুসলমান ক্ষুধার্ত অবস্থায় আসলে, আমি তার আহারের ব্যবস্থা করতাম। বস্ত্রহীন আসলে আমি তার কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতাম। নিয়মিত এ অবস্থা চলতে থাকত। একদিন এক মুশরিকের সাথে আমার সাক্ষাত হল, সে বলল আমি ধনী এবং বেশ স্বচ্ছল। তুমি অন্য কারও কাছ থেকে করজ না করে, যখন যা প্রয়োজন হয়, আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। আমি বললাম, এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে ? তারপর আমি এ ব্যক্তি থেকে করজ নেয়া শুরু করলাম। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পেলেই তার কাছ থেকে ধার নিয়ে মেহমানদের খিদমত করতাম অথবা রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতাম। একবার আমি অযূ করে আযান দেয়ার জন্য মাত্র দাঁড়িয়েছি, এমন সময় এ মুশরিক একদল লোক সাথে নিয়ে এসে আমাকে বলল, হে হাবশী! আমি তার দিকে তাকাতেই সে আমাকে অকথ্য ভাষায়



গালিগালাজ শুরু করে বলল, মাস শেষ হতে আর কত দিন বাকী? আমি বললাম আরও চার দিন বাকী আছে। সে বলল, মাসের শেষে আমার সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা না হলে, আমি তোকে আমার টাকার বিনিময়ে গোলাম বানিয়ে নেব এবং পূর্বের ন্যায় ছাগল চরিয়ে বেড়াবে। অতঃপর সে চলে গেল। কথাগুলো শুনে সারাটা দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে তা কেবল আল্লাহ্ তাআলা জানেন। ইশার নামাযের পর আমি নির্জনে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বলে এবং আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, এ মুহূর্তে ঋণ পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা আপনার কাছেও নেই, আমার পক্ষেও এত দ্রুত কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে আমাকে অপমান না করে ছাড়বে না। তাই, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকব। ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ আপনার হাতে আসলেই আমি চলে আসব।

এ কথা বলে আমি ঘরে ফিরে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকি। ভোর হতে না হতেই এক ব্যক্তি ছুটে এসে আমাকে বলল, তুমি এখনই রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হও। আমি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, মাল-রসদে ভর্তি চারটি উষ্ট্রী বসে রয়েছে। আমাকে দেখে রাসূল (সাঃ) হাসি মুখে বললেন, বেলাল! সুসংবাদ নাও! আল্লাহ্ তাআলা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ নাও চারটি উষ্ট্রী। এদের পিঠে যে সমস্ত মাল আছে, সবই তোমার হাওলা করলাম। ফেদাকের সর্দার এগুলো আমার জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছেন। যাও তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে আস। আমি আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করলাম এবং পরম আনন্দের সাথে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে আসলাম। রাসূল (সাঃ) মসজিদেই আমার অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ আপনাকে সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কোন ঋণ বাকী নেই। তিনি (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মালপত্র থেকে কোন কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি আদেশ করলেন যে, এগুলোও বন্টন করে দাও। যেন আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো নিঃশেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাড়ি যাব না। দিনের শেষে ইশার নামাযের পর রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

অবশিষ্ট মালগুলো কি শেষ হয়েছে? না কি এখনও বাকী আছে? আমি আরয করলাম, এখনও কিছু বাকী রয়ে গেছে। প্রয়োজন আছে এমন কোন দরিদ্র লোক আসেনি। তিনি বললেন, আমি আজ ঘরে না গিয়ে মসজিদেই থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদেই আহার করলেন। দ্বিতীয় দিন ইশার নামাযের পর রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বেলাল? কিছু বাকী আছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে শান্তি দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) আনন্দিত হয়ে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ভয় হয়েছিল, আল্লাহ্ না করুন ! হাতে কিছু মাল থাকা অবস্থায় মৃত্যু এসে যায় না কি। অতঃপর তিনি (সাঃ) আনন্দের সাথে ঘরে ফিরলেন । যাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর কোন সম্পদ রেখে যেতে চান না। রাসূল (সাঃ)-এর তো কোন কথাই নেই। তিনি ছিলেন নবীদের সরদার। তিনি কি করে ধন-সম্পদ রেখে যাবেন? তিনি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কাজেই ধন-দৌলত কখনও নিজের অধিকারে রাখতেন না, কারণ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে।

## দু'ব্যক্তি সর্ম্পকে রাসূল (সাঃ)-এর অভিমত

রাসূল (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী (রাঃ)-সহ উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় একটি লোক তাঁদের সম্মুখ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন! এ চলে যাওয়া লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? সাহাবী (রাঃ)-গণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি অত্যন্ত শরীফ এবং সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত। কোথাও তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করলে তা সাদরে গৃহীত হবে আর কারো জন্য সুপারিশ করলে নিশ্চয় রক্ষা করা হবে। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) নিঃচুপ রইলেন।

এরপর অন্য এক ব্যক্তি এ পথ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? জবাবে সাহাবা (রাঃ)-গণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি একজন সাধারণ মুসলমান এবং নিঃস্ব গরীব। তাঁর জন্য কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করলে সাদরে গ্রাহ্য হবে না। তাঁর জন্য কোথাও সুপারিশ করলে, তা কার্যকর হবে না। সাহাবা (রাঃ)-গণের কথাবার্তা শোনার পর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত লোক দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির সমতুল্য হতে পরবে না। এ কথার তাৎপর্য হল, পার্থিব মানসম্মানের কোন মূল্যই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কোন কোন মানুষের কাছে একজন নিষ্ঠাবান গরীব মুসলমানের



কোন মূল্য নেই । অথচ সে আল্লাহ্র কাছে তাকওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মর্যাদার অধিকারী। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে দিন আল্লাহ্র নাম নেয়ার মত একটি লোকও পৃথিবীতে থাকবে না, সেদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' আল্লাহ্র নামের বরকতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব এখনো টিকে রয়েছে।

## দরিদ্রতাই রাসূল (সাঃ) প্রেমিকদের বৈশিষ্ট্য

এক সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি (সাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি যা বলছ, তা চিন্তা-ভাবনা করে বল। সে সাহাবী (রাঃ) পুনঃ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি (সাঃ) পুনরায় একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার প্রশ্নোত্তর হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি যদি নিজ দাবীতে সত্য হও, তাহলে দারিদ্র অবলম্বনের জন্য প্রস্তুতি নাও। কেননা যাঁরা আমাকে ভালবাসে, তাঁদের দিকে দরিদ্রতা এত দ্রুত ধাবিত হয়, যেমন পানির স্রোত যেভাবে দ্রুত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ ও নবী প্রেমিক ওলামা-মাশায়েখগণ অধিকাংশ সময় দারুন অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকেন।

## আম্বর অভিযানে রসদের অনটন

অষ্টম হিজরীতে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে তিনশত সৈন্যের একটি বাহিনীসহ হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সমুদ্রোপকূল অভিমুখে রওয়ানা করেন। এ অভিযানে তাঁদের রসদস্বরূপ দেয়া হয়েছিল কিছু খেজুর। সেখানে পনের দিন অবস্থান করার পর তাঁদের সমুদয় রসদ নিঃশেষ হয়ে গেল। দানবীর সাহাবী হযরত কায়েস (রাঃ) মদীনায় ফিরে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে সাহাবাদের কাছ থেকে উট ক্রয় করে জবাই করতে আরম্ভ করলেন। প্রতি দিন তিনটি করে উট জবাই হতে লাগল। তৃতীয় দিন সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এ ভেবে উট জবাই করা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন যে, এভাবে উট জবাই হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মদীনায় ফিরে যাওয়া মহা সমস্যা দেখা দিবে। অবশেষে তিনি যাঁর কাছে যা কিছু খেজুর অবশিষ্ট ছিল সবই একত্রিত করে একটি থলিতে ভর্তি করে

প্রত্যেককে দৈনিক মাত্র একটি করে খেজুর দিতে লাগলেন। যুদ্ধের ময়দানে যেখানে শক্তি ও বলের প্রয়োজন সেখানে দৈনিক একটি মাত্র খেজুরের উপর নির্ভর করে যুদ্ধাভিযান চালান কত বড় মনোবলের পরিচায়ক। যদি তাঁদের এরূপ মনোবল না হত এরূপ করা সম্ভব হত না। পরবর্তীকালে হযরত যাবের (রাঃ) যখন এ ঘটনা তাঁর সহচরদের শুনাচ্ছিলেন তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একটিমাত্র খেজুর দ্বারা কি করে দিন কাটাতেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন? হযরত যাবের (রাঃ) বললেন, এর মর্ম তখনই উপলব্ধি হয়েছিল যখন একটি খেজুরও আর অবশিষ্ট ছিল না। তখন আমরা গাছের শুক্না পাতা পানিতে ভিজিয়ে খেতে লাগলাম। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবী (রাঃ)-দের এ মহাসংকট দূর করলেন এবং বিরাটকায় আম্বর নামক একটি মাছের মাধ্যমে। মাছটা এতবড় ছিল যে, তিনশত সৈন্যের কাফেলা ক্রমাগত আঠার দিন খেয়েও তা শেষ করতে পারেনি। অবশেষে মাছটির কিছু অংশ মদীনায়ও আনা হয়েছিল।

রাসূল (সাঃ)-বিস্তারিত ঘটনা শুনে বলেছিলেন, এ রিযিক আল্লাহ্র তরফ হতে তোমাদের জন্য বিশেষ দান স্বরূপ। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এ দুনিয়ার একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের কাছে এগুলো অধিকমাত্রায় এসে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী-রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে থাকেন। তারপর যাঁরা সর্বোত্তম লোক তারাও দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে পতিত হয়ে থাকেন। এভাবেই দ্বীনদারীর পর্যায় হিসাবে মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ্র খাস বান্দাদের কাছে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তারপর তাঁদের সুখও অনিবার্য। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের অগ্রগামীরা কিরূপ জীবন যাপন করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যে ধর্মকে আজ আমরা হেলায় হারাতে বসেছি সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন। দিনের পর দিন উপবাস করেছেন, গাছের পাতা খেয়েছেন, পেটে পাথর বেঁধেছেন, বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন। আজ আমরা সে ধর্মকে রক্ষাও করতে পারছিনা। আমরা আজ তাঁদের মত ও পথ থেকে কত দূরে?

# পঞ্চম অধ্যায়

## সাহাবী (রাঃ)-দের পরহেযগারী

আমাদের সাহাবায়ে কিরামের প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি অভ্যাস অনুসরণ ও আমল করার উপযোগী। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য একমাত্র তাঁদের জামাতকেই নির্বাচিত করেছেন। সাহাবীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'আমি শ্রেষ্ঠতম মানুষের যুগে প্রেরিত হয়েছি।' অতএব, শ্রেষ্ঠতম যুগের শ্রেষ্ঠতম লোকদেরকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য বাছাই করা হয়েছিল।

## রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরহেযগারী

একদিন রাসূল (সাঃ) একটি জানাযা থেকে ফিরার পথে একটি মেয়েলোকের দাওয়াত গ্রহণ করলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে যখন আহার করতে বসলেন তখন তিনি একখন্ড গোশ্‌ত চিবাচ্ছিলেন অথচ তা গিলতে পারছেন না। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার মনে হয় গোশ্‌তটির কোথাও কিছু গলদ রয়েছে। মেয়েলোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বকরী আনার জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছিলাম কিন্তু বকরী না পাওয়াতে আমার প্রতিবেশীর একটি বকরী ক্রয় করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মালিক বাড়ি না থাকায় তার স্ত্রী বকরীটি পাঠিয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, এর গোশ্‌ত কয়েদীদেরকে খাইয়ে দাও। সন্দেহজনক কোন জিনিস এরূপ হয়ে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা বিরল নয়।

## সন্দেহযুক্ত খেজুর

একদিন রাসূল (সাঃ) সারাটি রাত বিনিদ্র অবস্থায় ছটফট করছিলেন। বিবিদের মধ্য হতে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনার ঘুম হচ্ছে না কারণ কি? তিনি (সাঃ) বললেন, একটি খেজুর পড়েছিল, নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে আমি তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলেছি, কিন্তু পরক্ষণই মনে হল; তা যদি সদ্‌কার মাল হয়ে থাকে? এ চিন্তায় আমার ঘুম আসছে না। সদ্‌কার মাল সন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সারাটি রাত ছটফট করে কাটিয়ে দিলেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এ যে, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি যত ইসলাম বহির্ভূত কাজ সব কিছু করেও আমরা আনন্দচিত্তে খাওয়া দাওয়া করছি, রাতভর আরামে নিদ্রা যাচ্ছি, আবার নবীজীর উম্মত বলেও দাবী করছি।

## হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরহেযগারী

মুসলিম জাহানে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। সে আপন মুক্তির জন্য আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে প্রদান করত। একদিন এ ক্রীতদাস কিছু খাদ্য হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সম্মুখে আনয়ন করলে তিনি এক লোকমা খেলেন। ক্রীতদাস বলল, আমীরুল মু'মেনীন! আমি এ খাদ্য কোথা থেকে এনেছি তা জিজ্ঞেস করলেন না? তিনি বললেন, ক্ষুধার তীব্রতায় আমি সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছি, এখন বল, এ খাদ্য তুমি কোথা থেকে এনেছ? সে বলল, অন্ধকার যুগে আমি কাফের থাকা অবস্থায় এক গোত্রের লোকদের কিছু তদবীর করেছিলাম। তারা আমাকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করেছিল। আজ তাদের সেখানে বিবাহের উৎসব ছিল, আমি সেখানে গেলে ঐ মজুরী বাবত এ খাদ্য দিয়েছে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছ। এ বলে তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বমি হল না, তীব্র ক্ষুধা অবস্থায় খাওয়া একটি মাত্র লোকমা সহজে কি বের হয়? তাঁর কষ্ট দেখে এক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত করুন! একটিমাত্র লোকমার জন্য এত কষ্ট? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকমা বের করতে আমার জীবনও যদি বিপন্ন হয় তবুও তা বের করব। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি, যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তা জাহান্নামের আগুনের উপযোগী। আমার শরীরের কোন অংশ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত না হোক, তা আমি চাইনা, শুধু এ জন্যেই প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি। একবার তাঁর এক ক্রীতদাস অন্ধকার যুগে জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে গায়েবের কোন কথা বললে ঘটনাক্রমে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্রীতদাসকে বিনিময়ে খাদ্য দিয়েছিল। সে খাদ্য থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে কিছু দিলে তিনি তা খেয়েছিলেন, কিন্তু পরে সমস্ত খাদ্য বমি করে ফেলেছিলেন। ক্রীতদাসের মাল হারাম নয়। কিন্তু শুধু সন্দেহের কারণে তিনি তা গ্রহণ করেননি। –(বুখারী)

## হযরত ওমর (রাঃ)-এর দুধ পান

একবার দুধ পান করে হযরত ওমর (রাঃ) এক অস্বাভাবিক স্বাদ অনুভব করেন। যিনি দুধ দিয়েছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ দুধ কোথায় পেলে? লোকটি বলল, আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম, সেখানে লোকেরা উটের দুধ দোহন করলেন। তারা আমাকেও ঐ দুধ থেকে কিছু অংশ দিয়েছিল। আমি সে দুধই আপনাকে দিয়েছি। শুনামাত্রই তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমি করে



ফেললেন। আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা সামান্যতম সন্দেহজনক বস্তুও গ্রহণ করতেন না, যেন তা দ্বারা শরীরের কোন অংশ প্রতিপালিত হয়ে না যায়। অথচ আজ আমরা অপবিত্র বস্তুও গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিনা।

## হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাগিচা দান

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, বায়তুল মাল থেকে কিছু গ্রহণ করি। কিন্তু ওমর (রাঃ) আমার কষ্ট হবে মনে করে আমাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করে বললেন যে, ব্যবসা জারী রাখলে খিলাফতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমি তা কবুল করি। এখন শোন, আমার অসিয়ত এ যে, বায়তুল মাল থেকে গৃহীত ভাতার পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি দান করলাম। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে অসিয়ত মোতাবেক বাগানটি দান করে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার পিতার উপর আল্লাহ্ রহমত করুন। তিনি চাইলে, তাঁর বিরুদ্ধে কারো মুখ খোলার কোন সুযোগ না থাকে। চিন্তার বিষয় যে, তাঁর ভাতার পরিমাণই বা কি ছিল? আর তাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন জনগণের তাগিদে, সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের কাজ পরিচালনার স্বার্থে। তদুপরি বিবি যে সামান্য অর্থ মিষ্টি খাওয়ার জন্য রেখেছিলেন, তাও মিষ্টি না খেয়ে তা পুনরায় বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। তারপরও মনে সন্দেহ। অবশেষে প্রতিদানস্বরূপ নিজের বাগানটাই দান করে গেলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও পাওয়া যাবে।

## একজন মুহাদ্দিসের পরহেযগারী

একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন আলী ইব্‌নে মা'বাদ (রহঃ)। তাঁর জীবনের একটি ঘটনায় বলেন, আমি একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থান করতাম। কালি শুকানোর জন্য আমার সামান্য মাটির প্রয়োজন হলে ঘরের দেয়াল থেকে সামান্য মাটি নিয়ে কালি শুকিয়ে ফেলি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এটাতো ভাড়াটিয়া বাড়ি। এর দেয়ালের মাটি ব্যবহার করার আমার তো কোন অধিকার নেই। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও মনে হল যে, এ সামান্য মাটি নিলে কি আর দোষ হবে? এটা নিতান্তই তুচ্ছ বস্তু। এ কথা ভেবে দেয়াল থেকে সামান্য মাটি নিয়ে শুকানোর কাজটা সেরে ফেলি। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি সামানে দাঁড়িয়ে বলছেন, কাল কিয়ামতে তুমি বুঝতে পরবে এ তুচ্ছ মাটি কি বস্তু। সত্যিকারভাবে যাঁরা পরহেযগার তাঁরা এ তুচ্ছ বস্তু সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করেন। পরহেযগারী ও আল্লাহ্ ভীতিতে যিনি আল্লাহকে যত বেশি ভয় করেন, তিনিই তত বেশি পরহেযগার হয়ে থাকেন।

## কবর সম্বন্ধে উপদেশ

হযরত কোমায়েল (রাঃ) এক বর্ণনায় বলেন, আমি একবার হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তিনি হযরত আলী (রাঃ) ময়দানের মধ্যে একটি কবরস্থানে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে কবরবাসীরা, তোমাদের কি খবর? তোমরা কি অবস্থায় এখানে দিনাতিপাত করছ? অতঃপর তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন, হে কোমায়েল! যদি এ কবরবাসীরা কিছু বলতে পারত, তাহলে এ কথাই বলত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তাক্ওয়া ও পরহেযগারী। এ কথা বলেই তিনি কেঁদে বললেন, হে কোমায়েল! কবর হল আমলের সিন্দুক এবং মৃত্যুর সময় সব কিছু পরিষ্কার বুঝে আসে। অর্থাৎ মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছুই করে তা কবরের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। হাদীসে বর্ণিত আছে, নেক আমল সুদর্শন নেক লোকের বেশে মৃত ব্যক্তির সান্ত্বনার জন্য তার কাছে আগমন করে। আর বদ আমল বীভৎস বদলোকের বেশে মৃত ব্যক্তির কাছে আসে, যা তার জন্য অধিকতর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সাথে কবর পর্যন্ত তিনটি বস্তু যায়। (১) তার ধন-সম্পদ (২) তার আত্মীয় স্বজন, (৩) তার আমল। এরি মধ্যে ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন দাফনের পর ফিরে আসে আর আমল তার সাথে থেকে যায়।

রাসূল (সাঃ) একদিন এ বিষয়টি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এভাবে বলেছিলেন যে, মনে কর এক ব্যক্তির তিনটি ভাই আছে, মৃত্যুকালে সে একজনকে ডেকে বলল, ভাই! তুমি জান আমার উপর কিরূপ বিপদ আপতিত হয়েছে? এ মুহূর্তে তুমি আমার কি সাহায্য করতে পার? সে বলল, আমি তোমার চিকিৎসা করব, তোমার খিদমত করব, তোমার মৃত্যু হলে তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করব। অতঃপর তোমার মহিমা প্রচার করতে থাকব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাইটি হল তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজন। অতঃপর সে দ্বিতীয় ভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এ অবস্থায় তুমি আমার কি সাহায্য করতে পার? সে বলল, তোমার এবং আমার সম্পর্ক হল দুনিয়ার হায়াত পর্যন্ত। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্যত্র চলে যাব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাই হল মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ।

অতঃপর সে তার তৃতীয় ভাইকে ডেকে অনুরূপ প্রশ্ন করল। তখন সে বলল, দুনিয়াতেও আমি তোমার সাথে রয়েছি, কবরেও তোমার সাথেই থাকব



এবং ঐ নির্জন ঘরে তোমার বন্ধু হব। হিসাব-নিকাশের সময় নেকীর পাল্লায় বসে তা ভারী করে দিব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাই হল তার নেক আমল। অতঃপর তিনি সাহাবী (সাঃ)-দের উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন তোমরাই বল, এ লোকের কোন ভাইটি সত্যিকারভাবে কাজে এল? প্রথম দু' ভাই তো তার কোন কাজে এল না।

## হারাম ভক্ষণে দোয়া কবুল হয়না

রাসূল (সাঃ) বলেন. আল্লাহ্ তায়ালা নিজে পবিত্র এবং শুধু পবিত্র মালই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে যে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত মুসলমানকেও তিনি সে আদেশই দিয়েছেন। যেমন-কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে-يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ ঃ হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আমল করতে থাক। আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত রয়েছি। অন্যত্র মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া পবিত্র হালাল রিযিকসমূহ ভক্ষণ কর। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেন যে, সে লম্বা লম্বা সফর করত, যে কারণে তার মাথার চুল এলোমেলো থাকত, তার পোশাক ময়লাযুক্ত থাকত। এরূপ পেরেশান অবস্থায় সে ব্যক্তির দু হাত আকাশের দিকে তুলে বলে, ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্! কিন্তু তার খাওয়া-পরা পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই হারাম মালের। এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? আমাদের সর্বদাই অভিযোগ যে, আমাদের দোয়া কবুল হয় না। কেন যে দোয়া কবুল হয় না তা এ হাদীস দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে ফাসিক গুনাহ্গারের কেন, অনেক সময় কাফেরের দোয়াও কবুল করেন। তবে মুত্তাকী পরহেযগারদের দোয়াই প্রকৃত দোয়া। সেজন্যই সবাই পরহেযগারদের দ্বারাই দোয়া কবুল করানোর আশা করেন। যারা নিজের দোয়া কবুল হওয়ার আশা রাখেন তাদের অবশ্যই হারাম মাল বর্জন করা উচিত।

## দোয়া করার পদ্ধতি

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- দোয়া করার প্রকৃত নিয়ম হল তোমরা নিজেদের হস্তযুগলকে কাঁধ বরাবর অথবা তার নিকটতম পরিমাণ উত্তোলন করবে। আর ইস্তিগফার করলে একটি আংগুলী দ্বারা ইংগিত করবে। প্রকৃত দোয়া করার পদ্ধতি হল, তোমার হস্তযুগলকে একই সাথে সম্প্রসারিত করবে। অন্য এক বর্ণনায় দোয়ার এ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে যে, উভয় হস্তকে উত্তোলন করতে হবে এবং হস্তের তালুকে নিজের মুখমন্ডলের দিকে রাখতে হবে। -(আবু দাউদ ও মিশকাত)। দোয়ায় হস্ত উত্তোলন করে কাকতি মিনতি সহ দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়। যেমন সাহাবী হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কোন বান্দা হস্ত উত্তোলন করে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তখন তিনি বান্দাকে খালি-হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত)। রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে কোন দোয়া করলে তিনি হস্ত উত্তোলন করে দোয়া করতেন আর এটাই ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "রাসূল (সাঃ)-এর এ অভ্যাস ছিল যে তিনি দোয়াকালীন করতালু নিজের মুখমন্ডলের দিকে করতেন। -(জামেউ সাগীর-সূযূতী)

দ্রষ্টব্য ঃ "দোয়া কবুলের প্রধান শর্ত হল হালাল রোজগার।"

## হযরত ওমর (রাঃ)-এর সতর্কতা

বাহ্‌রাইন থেকে একবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে কিছু মেশ্‌ক আসলে তিনি বললেন, কেহ এগুলো ওজন করে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তাঁর স্ত্রী হযরত আতেকা (রাঃ) আরয কররেন, আমিই এগুলো মেপে দিব। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, কেহ এগুলো বন্টন করে দাও। স্ত্রী আবার বললেন, আমি এগুলো বন্টন করে দিতে পারি। তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার আবার যখন এরূপ বলাবলি হল, তখন তিনি বললেন, আমার মন চায় না যে, তুমি এগুলো নিজের হাতে পাল্লায় রাখবে এবং পরে এ হাত শরীরে মালিশ করে দিবে। এভাবে হয়ত কিছুটা মেশ্‌ক আমার অংশে বেশি এসে যাবে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর কি আশ্চর্যজনক সতর্কতা। যে কেহ মেশ্‌ক





ওজন করবে, তার হাতে নিশ্চয় কিছুটা লাগবে। স্ত্রীর ওজন করাটা পর্যন্ত সহ্য করলেন না, একমাত্র আখিরাতের ভয়ে। হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার তাঁর খিলাফতের আমলে এরূপ মেশ্‌ক ওজন করার সময় নিজের নাক বন্ধ করে নিয়ে বললেন, সুগন্ধি গ্রহণই তো মেশ্‌কের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের পূর্ববর্তীদের এটাই ছিল সতর্কতার নিদর্শন। চিন্তা-চেতনায় তাঁরা কত সতর্কতা অবলম্বন করতেন উল্লেখিত ঘটনাই উপলব্ধি করা যায়।

## গভর্নরকে বরখাস্ত

কোন এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) গভর্নর নিযুক্ত করলে এতে এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল, হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফও এ ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ কথায় শুনে তাকে বরখাস্ত করে দিলেন। লোকটি বলল, আমি হাজ্জাজের শাসনামলে সামান্য কয়দিন গভর্নর ছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তার সাথে একদিন অথবা তার চেয়ে কম সময় থাকাও তোমার মন্দ হওয়ার জন্যই যথেষ্ট। সংশ্রবের একটা প্রভাব মানুষের মধ্যে নিশ্চয় পড়ে যায়। প্রবাদ আছে-সৎসঙ্গে জান্নাতবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। কাজেই খারাপ লোকের সংশ্রব ত্যাগ করা উচিত। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, খাবার লোকের উপকার ও গ্রহণ করতে নেই, কেননা এটাও এক সময় ক্ষতি ভয়ানক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি এবং পরিবেশশে শুধু মানুষ কেন? জীব-জানোয়ারের স্বভাবও মানুষের মধ্যে এসে যায়।

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে অহংকার আর বকরীর মালিকদের মধ্যে বিনয় দেখা যায়। রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, নেক লোকের সাহচার্যের দৃষ্টান্ত এ লোকের মত যে মেশ্‌ক বিক্রেতার কাছে বসলে, যদি সে মেশ্‌ক নাও কিনে তবুও তার সুগন্ধে মস্তিষ্ক শীতল হয়। পক্ষান্তরে রাসূল (সাঃ) অসৎলোকের সংশ্রবকে কামারের চুলার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ গায়ে না আসলেও তার উত্তাপ ও ধোঁয়া থেকে নিশ্চয় নিস্তার পাবে না।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## নামাযে অনুরাগ ও বিনয়

নামায হল মু'মিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। ক্বিয়ামতের দিন ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুফর এবং ইসলামের মাঝখানে নামাযই হল একমাত্র অন্তরায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে কাফেরের সমতুল্য। নামায সম্পর্কে কোরআনে ঘোষিত হয়েছে- "যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী তারাই তাঁদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৩১ঃ ৪-৫)। নামায সম্পর্কে হাদীসে আরও বলা হয়েছে- নামায ধর্মের খুঁটি, যে ব্যক্তি দৃঢ় রাখে এবং যে তা ত্যাগ করে সে ধর্মকে ধ্বংস করে। -(সগীর)

## নফল নামায আদায়কারীদের মর্যাদা

মহান আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমার পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। কোন বান্দা ফরয ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তবে নফলের সাহায্যে বান্দা আমার এত অধিক নৈকট্য লাভ করে যে, আমি তাকে আমার মাহবুবরূপে গ্রহণ করি। তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যদ্দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাতে হয়ে যাই যদ্দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে, যাই যদ্দ্বারা সে চলে, সে আমার কাছে কিছু চাইলে, আমি তা দান করি, আর কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে, আমি তার হিফাযত করি। আল্লাহ তায়ালার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি হয়ে যাওয়ার অর্থ এটা যে, তখন তার দেখা-শুনা, চলা-ফেরা সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বাইরে আর কোন কাজই সে করতে পারে না। কত বড় সৌভাগ্যবান এ সব লোক, যারা ফরয আদায় করার পর অতি মাত্রায় নফল আদায় করেন। আমাদের সকলকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদের সকলকে এ মহা মূল্যবান সম্পদ দান করুন। আমীন॥

## রাসূল (সাঃ)-এর সারারাত নামায ও কিরআত

হযরত আয়েশা (রাঃ) কে এক ব্যক্তি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর এমন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা আমাকে বলুন যাআপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর কোন ঘটনা আশ্চর্যজনক নয়। এক রাতে তিনি



আমার ঘরে আগমন করে আমার পাশে শুয়ে অল্পক্ষণ পরেই বললেন, আমি ইবাদত করব। এ বলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়। তারপর রুকু করলেন, সেখানেও এভাবেই কাঁদলেন, অতঃপর সিজদা করলেন, সেখানেও এভাবে কাঁদলেন। তারপর সিজদা থেকে উঠেও অনুরূপভাবে কাঁদলেন, এভাবে ভোর পর্যন্ত নামাযের মধ্যে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। এমন কি হযরত বেলাল (রাঃ) এসে ফযরের নামাযের জন্য ডাক দিলে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আপনার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ হওয়া সত্ত্বেও আপনি এত বেশি কাঁদছেন কেন? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, আমি কি তার কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? রাসূল (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন তখন তার কিয়াম করা অর্থাৎ সূরা তিলাওয়াতে দাড়িয়ে থাকা যে কত সুদীর্ঘ হত তা সাধারণ মানুষের ধারণায়ও আসা অসম্ভব।

## রাসূল (সাঃ)-এর ইবাদত

রাসূল (সাঃ) ইবাদত বন্দেগীতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। নফল রোযা রাখতেন আবার মাঝে ছেড়ে দিতেন, রাত জেগে নামায পড়তেন এবং নিদ্রাও যেতেন। সবকিছুতেই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। কালাম মজীদে রাসূল (সাঃ)-এর উম্মতকে তাই মধ্যপন্থী বলা হয়েছে।

## রাসূল (সাঃ)-এর কিরআত

এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্র কাঠে সে নামায অধিক প্রিয় যে নামাযে কিয়ামে দাড়িয়ে থাকা সুদীর্ঘ হয়। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত, ফেটে যেত। কখনও কখনও প্রায় সারা রাতই দাঁড়িয়ে কেটে যেত। হযরত হোযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়েছিলাম। তিনি সূরাহ বাকারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়তঃ তিনি একশ আয়াতে রুকু করবেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন, আমি মনে মনে বললাম হয়তঃ তিনি এ সূরাহটি শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরাহ নিসা শুরু করলেন এবং তা পড়ে ফেললেন। এরপর সূরাহ আল ইমরান শুরু করলেন এবং তাও শেষ করে ফেললেন। তিনি তারতীল সহকারে অর্থাৎ ধীরে সুস্থে থেমে থেমে কিরআত করছিলেন। যখন তিনি কোন তাসবীহের আয়াতে পৌছতেন তখন তাসবীহ করতেন এবং কোন প্রার্থনায় স্থানে পৌছলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেন আর আশ্রয় প্রার্থনা আয়াতে পৌছলে আল্লাহ্র

কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকু করতেন, তিনি বলতে থাকলেন "সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম" পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার মহান আল্লাহ্‌র। তাঁর রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতে উঠাতে বললেনঃ সামিআল্লাহ্‌ লিমান হামিদাহ-রাব্বানা লাকাল হামদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শুনছেন, তাঁর প্রশংসা বাণী যে আল্লাহ্‌র প্রসংশা করছে। এ সময় তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন, প্রায় যত সময় রুকু করেছিলেন, তত সময় পর্যন্ত। তারপর তিনি সিজদাহ করলেন এবং এতে বললেনঃ সুবাহানা রাব্বিয়্যাল আলা অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রবের। তার সিজদাও ছিল প্রায় কিয়ামের সমান।-(মুসলিম)। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন নামায উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত হয়।-(মুসলিম)

## রাসূল (সাঃ)-এর চার রাকাত নামাযে ছয় পারা পাঠ

হযরত আউফ (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূল (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলাম। রাসূল (সাঃ) মিসওয়াক করে ওযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে নামাযে শরীক হলাম। তিনি প্রথম রাকাতে সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াত করলেন, তিনি প্রতি রহমতের আয়াতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রহমতের দোয়া করলেন। আবার প্রতিটি আয়াতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সূরা বাক্বারাহ্‌ শেষ করে রুকু করলেন। রুকু সূরা পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত লম্বা করলেন। রুকুর মধ্যে তিনি- سبحان ذى الجبروت والملكوت والجبروت - এ দোয়া পড়ছিলেন। অতঃপর রুকুর সমপরিমাণ সময় সিজদায় কাটালেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা বাকারার ন্যায় সূরা আলে ইমরান পড়লেন। প্রতি রাকাতে এক একটি সূরা পড়ে চার রাকাতে মোট সোয়া ছয় পারা তিলাওয়াত করলেন। চিন্তা করার বিষয় যে, নামাযটি কত সুদীর্ঘ ছিল? হযরত হোযায়ফা (রাঃ) একবার এভাবে রাসূল (সাঃ) সাথে চার রাকাত দীর্ঘ নামায পড়েছিলেন। যার মধ্যে রাসূল (সাঃ) সূরা বাকারাহ থেকে সূরা মায়েদাহ পর্যন্ত মোট সোয়া ছয় পারা তিলাওয়াত করেছিলেন, তাজবীদও তারতীলের সাথে সোয়া ছয়পারা পড়া এবং প্রত্যেক রাকাতের আয়াতে দীর্ঘক্ষণ আশ্রয় চাওয়া, তদুপরি এ পরিমাণ দীর্ঘ রুকু, সিজদা করা কি সহজ ব্যাপার? কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) প্রথম রাকাতেই প্রথম তিন সূরা অর্থাৎ প্রায় পাঁচ পারা



পড়ে ফেলতেন। এত সুদীর্ঘ নামায এজন্যই সম্ভব ছিল যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার চোখের তৃপ্তি হল নামাযের মধ্যে। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকেও প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন॥

## সুদীর্ঘ নামায

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ) নামাযে দাঁড়ালে মনে হত যেন একটি কাঠখন্ড মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ একটুও নড়াচড়া করতেন না। মুহাদ্দিসীনগণ বর্ণনা করেন, হযরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে নামায শিখলেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে নামায শিক্ষা করেছেন। এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) এত লম্বা সিজদা করতেন যে, পাখি এসে তাঁর কোমরের উপর বসে যেত। কোন কোন সময় এত লম্বা রুকু করতেন যে, সারা রাত রুকুতেই কাটিয়ে দিতেন। আবার কোন কোন সময় একই সিজদায় সারা রাত কেটে যেত।

এক যুদ্ধের সময় হযরত ইব্‌নে যুবযের (রাঃ) এক মসজিদে নামায পড়ছিলেন। একটি গোলা এসে মসজিদের দেয়ালে বেঁধে যায়। তাতে দেয়ালের একটি টুকরা ভেঙ্গে হযরত ইব্‌নে যুবায়েরের দাড়ি ও গলার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে। এতে তিনি বিচলিতও হলেন না এবং রুকু সিজদাও সংক্ষেপ করলেন না। একবার তিনি ঘরে নামায পড়ছিলেন। তাঁর শিশু পুত্র হাশেম তাঁর পাশেই ঘুমাচ্ছিল। ঘরের ছাদ থেকে একটি সাপ্প পড়ে গিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে, তাতে শিশুটি চিৎকার শুরু করে। বাড়ির লোকজন দৌড়ে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে। সাপটি মারতে যেয়ে প্রচুর হৈ-চৈ ও শোরগোল হয়। কিন্তু ইব্‌নে যুবায়ের অত্যন্ত শান্ত ও মনযোগ সহকারে নামাযেই লিপ্ত রইলেন। নামায শেষে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন যেন একটু হৈ-চৈ হল, কি ব্যাপার? স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌ আপনার উপর রহমত করুন। ছেলেটি তো মারাই যেত। আপনার তো কোন খবরই নেই। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! নামাযের মধ্যে অন্য কোন কিছুর খেয়াল করলে কি নামায পরিপূর্ণ হয়?

হযরত ওমর (রাঃ) যখন আততায়ীর আঘাতে আহত হয়ে অন্তিম শয্যায় শায়িত, জখম হতে রক্ত নির্গত হত এবং বেশির ভাগ সময় অচেতন অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হত এরূপ অবস্থায়ও তিনি নামায আদায় করতেন এবং বলতেন, ইসলামে এ ব্যক্তির কোন অংশ

নেই, যে নামায পরিত্যাগ করে। হযরত ওসমান (রাঃ) সারা রাত জেগে নামাযে মাশগুল থাকতেন এবং এক রাকাতের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করতেন।

নামাযের সময় হলেই হযরত আলী (রাঃ)-এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যেত। খাল্‌ফ্‌ ইব্‌নে আইউব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নামাযের মধ্যে মাছি আপনাকে বিরক্ত করে কি? তিনি বললেন, ফাসেকরা বেত্রাঘাতের শাস্তি ভোগ করে, কিন্তু একটুও নড়ে না এবং গর্ব ভরে বলে বেড়ায়, আমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখলে? এত বেত খেলাম কিন্তু একটুও নড়িনি। এটা কি করে সম্ভব যে আমি আমার রবের সামনে দাঁড়াব আর সামান্য মাছির কামড়ে নড়াচড়া করব? হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন ঘরের লোকজনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমরা কথাবার্তা বলতে থাক, তোমাদের কথাবার্তা আমার নামাযে কোন ক্ষতি হবেনা।

তিনি একবার বসরার জামে মসজিদে নামায পড়াকালে মসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়ল। অনেক লোক জমা হয়ে অনেক হৈ-চৈ হল অথচ তিনি এসব কিছুই অবগত ছিলেন না।

হযরত হাতেম আ'সাম (রহঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি নামায কিরূপে আদায় করেন? তিনি বললেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন অযু করার পর নামাযের মুসল্লায় কিছুক্ষণ বসে থাকি। সমস্ত শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়, তখন নামাযের জন্য দাঁড়াই। এভাবে, কাবা শরীফ যেন আমার চোখের সামনে, পুলসিরাত যেন আমার পায়ের নীচে, জান্নাত আমার ডান দিকে, জাহান্নাম আমার বাম দিকে, মালাকুল মওত যেন আমার ঘাড়ের উপর দাঁড়ায়, আর মনে করি এটাই যেন আমার জীবনের শেষ নামায। অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে ধীরে সুস্থে নামায আদায় করি। তারপর আশা নিরালার মাঝখানে অবস্থান করি। এত কিছুর পরেও আমার নামায কবুল হল কি-না? নিশ্চিন্ত হতে পারিনা?

## এক আনসার ও এক মুহাজিরের চৌকিদারী

এক যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) ফিরার পথে রাস্তায় এক জায়গায় রাত্রি যাপন করলেন। তিনি সাহাবী (রাঃ)-দের বললেন, আজ রাতে পাহারায় কে থাকবে? একজন আনসার হযরত আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির (রাঃ) এবং একজন মুহাজির হযরত আব্বাস ইব্‌নে বিশ্‌র (রাঃ) বললেন, আমরা থাকব। রাসূল (সাঃ) একটি পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, এ দিক থেকে শত্রুর হামলার আশংকা



রয়েছে। তোমরা ওখানে গিয়ে পাহারায় নিযুক্ত থাক। তাঁরা উভয়েই সেখানে চলে গিয়ে আনসার মুহাজিরকে বললেন যে, চল রাতটিকে দু' ভাগ করে আমরা পর্যায়ক্রমে পাহারা দেই। একাংশে তুমি ঘুমাবে, আমি জেগে থাকব। আর একাংশে আমি ঘুমাব, তুমি জেগে থাকবে। অন্যথায় হয়ত দুজনই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। তাতে পাহারার কাজ ব্যাহত হবে। জাগ্রত ব্যক্তি যদি শত্রুর আশংকা দেখলে সে তার ঘুমন্ত সাথীকে জাগাবে। রাতের প্রথম অংশে আনসারীর জাগার পালা নির্ধারিত হল। তাই মুহাজির শুয়ে পড়লেন। আনসারী বসে না থেকে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় এক দুশমন এসে আনসারীকে নামাযে দেখে তীর ছুঁড়লে তিনি তীর বিদ্ধ হলেন, কিন্তু একটুও নড়লেন না। সে আর একটি তীর মারল। এ তীরও তাঁর গায়ে বিদ্ধ হল। এবারও তিনি নড়লেন না। শত্রু তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করল। তিনি তীর বিদ্ধ হতে থাকেন আর নিজ হাতে টেনে ফেলতে থাকেন। অতঃপর তিনি শান্তভাবে রুকু, সিজদা করে নামায শেষ করে সাথীকে ডাকলেন। দুশমন একজনের স্থানে দুজনকে দেখে ভাবল, না জানি এখানে আরও কত লোক রয়েছে দাতা ভেবে প্রাণ ভয়ে সে পালাল?

মুহাজির ঘুম থেকে জেগে দেখলেন সাথীর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ"। তুমি প্রথমেই আমাকে কেন জাগালে না? আনসারী বললেন, আমি নামাযের মধ্যে সূরা কাহফ পড়ছিলাম। সূরাটা শেষ না করে রুকু করতে আমার মন চাইল না। কিন্তু আমার ভয় হল, যদি তীর খেয়ে খেয়ে আমি মারা যাই, তাহলে রাসূল (সাঃ) যে পাহারার দায়িত্ব দিয়েছেন তা সম্পন্ন হবে না। এ ভয় যদি না হত তাহলে আমি মারা গেলেও সূরাটা শেষ না করে রুকু করতাম না। এ ছিল সাহাবায়ে কিরামের নামাযের নমুনা। তীরের আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু নামাযের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন আনায়ন করেননি। আর আমাদের নামাযের অবস্থা হল, সামান্য মশা-মাছির কামড়েই মনযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়। নামায়ে বসে কত চিন্তা-ভাবনা করি। তখন নামায পড়ছি কিনা তার কোন খেয়ালই থাকে না।

নামাযের মধ্যে খেয়াল নষ্ট হওয়ার দরুন হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর বাগান ওয়াকফ করা। একদিন নিজ বাগানে হযরত আবু তালহা (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি পাখি এদিক সেদিক উড়তে লাগল। বাগান খুব ঘন থাকার কারণে সেটা বের হতে পারছিল না। নামাযের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি

পাখির দিকে গেল। এমন কি তিনি কত রাকাত নামায পড়েছেন, তাও ভুলে গেলেন। এতে তিনি ভীষণ মনক্ষুন্ন হয়ে সে বাগানটাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সব ঘটনা বলে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বাগানটি খরচ করুন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় একজন আনসারী নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানে পাকা খেজুরের কাঁদিগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছিল। নামাযের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি কাঁদিগুলোর উপর পড়ে এবং এগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কত রাকাত নামায পড়েছেন তা ভুলে যান। বাগানের কারণে নামাযের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় তিনি মনে দারুন কষ্ট পেলেন। তাই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমি এ বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত খরচ করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) উক্ত বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহাম বিক্রি করে তা ধর্মীয় উন্নয়ন কাজে ব্যয় করে দিলেন।

## নামাযের খাতিরে ইব্‌নে আব্বাসের চক্ষু চিকিৎসা ত্যাগ

যখন চক্ষু রোগে আক্রান্ত হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), তখন একজন চিকিৎসক তাঁর খিদমতে বললেন, আমি আপনার চোখের চিকিৎসা করতে পারি এ শর্তে যে, আপনি পাঁচ দিন জমীনে সিজদা না করে কোন উঁচু জায়গায় করবেন। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তা কখনও হতে পারে না। আমি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

কারণ বশতঃ এরূপে নামায আদায় করা যদিও জায়েয তবুও সাহাবীদের নামাযের প্রতি যে গুরুত্ব ছিল এবং রাসূল (সাঃ) এর হুকুমের প্রতি তাঁদের যে আস্থা আসক্তি ছিল তারই ফলশ্রুতিতে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) চক্ষু চিকিৎসা করালেন না। নামাযের জন্য তাঁরা সমস্ত দুনিয়া কুরবান করতে পারতেন। নামাযের বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি করে পার্থিব অতি মূল্যবান বস্তুকেও তাঁরা রক্ষা করতে রাজি হতেন না। আজ আমরা নির্লজ্জের মত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী



(রাঃ)-দের শানে যা ইচ্ছা তাই বলে ফেলি। কিন্তু হাশরের দিন যখন তাঁদেরকে অনন্ত অসীম সুখে দেখব, তখন বুঝে আসবে তাঁরা কি ছিলেন আর আমরা কি আছি?

## নামাযের সময় সাহাবীদের ব্যবসা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) একদিন বাজারে বসা অবস্থায় জামাতের সময় হলে তিনি দেখলেন, প্রত্যেকেই নিজ দোকান বন্ধ করে মসজিদে চলে গেছেন। তখন তিনি বললেন, এসব লোকের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

**অর্থ ঃ** "মসজিদে এমন সব লোক সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে; যাদেরকে ব্যবসা ও বেচা-কেনা আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না।"

এ সমস্ত নিষ্ঠাবান লোকদের সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যে ও কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকতেন কিন্তু আযান এর সাথে সাথেই মসজিদে প্রবেশ করতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদেরকে কখনও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বাজারে বসে ছিলেন। এমন সময় আযান হলে তিনি দেখলেন। লোকেরা মালপত্র রেখেই মসজিদে যাচ্ছেন দেখে তখন তিনি বললেন, এসব লোকদের সম্বন্ধেই কুরআনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- رجال لا تلهيهم الخ

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করত তারা কোথায়? তখন খুব সামান্য সংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ পুনরায় বলবেন, এসব লোক কোথায়? যারা রাত্রে বেলায় আরামের বিছানা ত্যাগ করে নিজের রবকে স্মরণ করত। এবারও একটি ক্ষুদ্র দল উঠে বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর ঘোষণা করা হবে; এ সব লোক কোথায়, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ্‌র

যিক্‌র ও নামায থেকে বিরত রাখতে পারত না। তখন সংক্ষিপ্ত একটি দল উঠে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সমস্ত হাশরবাসীর হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

## মর্মান্তিক শাহাদত

ওহুদের যুদ্ধে যেসব কাফেরবৃন্দ নিহত হয়েছিল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওহুদের যুদ্ধে সুলাফা নামক এক কাফের রমনীর দু' পুত্র হযরত আসেমের হাতে নিহত হয়। সুতরাং সুলাফা মানত করেছিল যে, আসেমের মাথা আমার হাতে আসলে আমি তার মাথার খুলি দ্বারা শরাব পান করব। অতএব, সে আরও ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি আসেমের মাথা এনে দিবে, একশত উট তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। এ ঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে সুফিয়ান ইব্‌নে খালিদ নামক এক কাফের হযরত আসেম (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। মদীনায় সে আজল ও কা-রা গোত্রের কিছু লোককে পাঠাল। এরা মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে এবং তালীম ও তাবলীগের জন্য কিছু সংখ্যক লোককে তাদের এলাকায় পাঠানোর জন্য রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অনুরোধ করল। বিশেষ করে হযরত আসেম (রাঃ)-কেও তাদের সাথে পাঠানোর আবেদন করল। কারণ, আসেমের বয়ান তাদেরকে খুবই আকৃষ্ট করবে বলে প্রকাশ করল।

সুতরাং রাসূল (সাঃ) দশজন সাহাবীর একটি দল (অন্য বর্ণনা অনুসারে ছয় জন) তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আসেম (রাঃ) কেও সেখানে পাঠালেন। পথিমধ্যে এ মুসলমান পরিচয় দানকারী মুনাফিকরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একশত প্রসিদ্ধ তীরন্দাজসহ চৌদ্দশত সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীদের খবরা খবর জানার জন্য সাহাবী (রাঃ)-দের এ দলটি পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় লেহ্‌ইয়াল গোত্রের দু' শত লোকের সাথে তাদের মোকাবিলা হয়েছিল। দশ অথবা ছ'জন সাহাবীর এ ক্ষুদ্র দলটি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিকটবর্তী ফিদ্‌ ফিদ্‌ নামক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।



কাফেররা বলল, আমরা তোমাদের রক্তে আমাদের ভূমিকে রঞ্জিত করতে চাই না। বরং তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কিছু মাল পেতে চাই, কাজেই তোমরা আমাদের সাথে আস। আমরা তোমাদের হত্যা করব না। তখন তাঁরা বললেন, আমরা কাফেরদের আশ্রয় চাইনা এ বলে তীরের সাহায্যে মোকাবিলা শুরু করলেন। তীর শেষ হলে বর্শা দ্বারা মোকাবিলা হল।

হযরত আসেম (রাঃ) সাথীদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, বন্ধুগণ! তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তোমরা ভয় পেয়ো না, শাহাদাতকে গণীমত মনে করে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায় আছেন এবং জান্নাতের হুরগণ' তোমাদের অপেক্ষায় আছেন। এ বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি বর্শা দ্বারা মোকাবিলা করলেন। যখন বর্শা ভেঙ্গে গেল তখন তলোয়ার দ্বারা শত্রুদের নিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু শত্রু সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্‌! তোমার রাসূলের কাছে আমাদের এ দুর্ঘটনার সংবাদ পৌছিয়ে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ রাসূল (সাঃ)-কে পৌছিয়ে দিলেন। হযরত আসেম (রাঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, সুলাফা তার মাথার খুলি দ্বারা শরাব পান করার মানত করেছে। তাই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্‌! আমার শির তোমার রাস্তায় কাটা যাচ্ছে। কাজেই তুমি তা রক্ষা কর। তাঁর এ দোয়াও কবুল হয়েছে।

তাঁর শাহাদাতের পর কাফেররা যখন তাঁর শির কাটার জন্য প্রস্তুত হল তখন আল্লাহ্‌ এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এক ঝাঁক ভীমরুলের কথা এসেছে। সেগুলো তাঁর লাশকে ঘিরে ফেলল। এ দেখে কাফেররা মনে করল, রাত্রিবেলায় এগুলো চলে গেলে তারা হযরত আসেমের শির কেটে নিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে রাতে ভীষণ বৃষ্টি হল এবং পানির স্রোতে তাঁর লাশ যে কোথায় ভেসে গেল তা আর কেহ বলতে পারল না।

এভাবেই শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে করতে তিনজন বাদে সবাই শহীদ হলেন। যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত খোবায়ের (রাঃ) হযরত যায়েদ ইব্‌নে দাসনা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে তারেক (রাঃ)। শত্রুরা তাঁদেরকে অভয় দিল যে, তোমরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আস, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।

তাদের কথা বিশ্বাস করে তিন জনই যখন নিচে নেমে আসলেন তখন ধনুকের তার দিয়ে তাঁদেরকে হাত বাঁধা শুরু করল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তারেক (রাঃ) কাফেরদের বললেন, এটা তোমাদের প্রথম ধোঁকা। আমি কখনও তোমাদের সাথে যাব না। আমি আমার শাহাদতপ্রাপ্ত ভাইয়ের পথই অনুসরণ করব।

কাফেররা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আপন জায়গা ছাড়লেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল। বাকী রইলেন দু'জন। এ দু'জনকে তারা মক্কাবাসীদের হাতে বিক্রি করল। পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাফ্‌ওয়ান ইব্‌নে উমাইয়া হযরত যায়েদ ইব্‌নে দাস্‌নাকে পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। আর হুজারের ইব্‌নে আবি এহাব তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হযরত খোবায়েব (রাঃ) কে এক শত উটের বিনিময়ে ক্রয় করল। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হারেস ইব্‌নে আমেরের বংশধর হযরত খোবায়েব (রাঃ) হারেস ইব্‌নে আমেরকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য সফ্‌ওয়ান সাথে সাথেই একটি ক্রীতদাসের মাধ্যমে হারাম শরীফের বাইরে পাঠিয়ে দিল। এ হত্যাকান্ড দেখার জন্য বহু লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল। সে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যায়েদ। আল্লাহ্‌র কসম তুমি সত্য করে বল? তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমার পরিবর্তে আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করি, আর তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে থাক? হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হত্যা তো দূরের কথা, আমি এতটুকু সহ্য করব না যে, রাসূল (সাঃ) যেখানে আছেন সেখানেই তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি সুখে-শান্তিতে থাকি।

একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলল, "মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে যেরূপ ভালবাসে, এমন ভালবাসার নজির আমি কোথাও দেখিনি। এরপর হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হল। হযরত খোবায়ের (রাঃ) কিছু দিন বন্দী অবস্থায় রইলেন। হুজায়েরে যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি বলেন, হযরত যুবায়েব (রাঃ) আমাদের কয়েকখানায় বন্দী ছিলেন। একদিন আমি



দেখলাম তিনি একটা আঙ্গুরের গুচ্ছ খাচ্ছেন। সে সময় মক্কায় কোথাও কোন আঙ্গুর ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি লোম পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। হঠাৎ একটি শিশু তাঁর কাছে চলে গেল। হযরত খোবায়েব (রাঃ)-এর হাতে ক্ষুর আর তাঁর কাছেই শিশুটি দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কি ভাবছ আমি এ শিশুকে হত্যা করব। আমি এমন কাজ করব না।

এরপর হযরত খোবায়েব (রাঃ) কে শহরের বাইরে নিয়ে শূলীতে চড়ানোর পূর্বে তাঁর কোন অন্তিম ইচ্ছা আছে কি-না জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, এটা আমার দুনিয়া থেকে বিদায়ের এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের সময়। আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করার সময় দেয়া হোক। নামায শেষে তিনি বললেন, তোমরা যদি মনে না করতে যে, আমি মত্যুর ভয়ে নামাযের মধ্যে দেরি করছি। তাহলে আরও দু'রাকাত পড়তাম। শূলীতে তুলার পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এমন কি কেহ নেই যে তোমার রাসূল (সাঃ) কে আমার শেষ সালাম পৌঁছিয়ে দিবে। তৎক্ষণাৎ অহীর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) খোবায়েব (রাঃ)-এর সালাম পেয়ে রাসূল (সাঃ) বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া খোবায়েব। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, কাফেররা খোবায়েবকে শহীদ করে ফেলেছে। হযরত খোবায়েব ( রাঃ)-কে যখন শূলীতে চড়ানো হল, তখন কাফেররা চারদিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

এ সময় একজন তাঁকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও। তিনি বললেন, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি এটা পছন্দ করব না যে, রাসূল (সাঃ)-এর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক। এ সমস্ত কাহিনীর প্রতিটি শব্দই জ্ঞানপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। তবে এ কাহিনীতে দু'টি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য।

## নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা

রাসূল (সাঃ)-কে বিন্দুমাত্র কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখতে সাহাবীদের জীবন উৎসর্গ করার আকাংখা। হযরত খোবায়েব (রাঃ)-এর মুখ দ্বারা উচ্চারণ

করানোটাই কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা. রাসূল (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা তখন কাফেরদেরও ছিল না। তদুপরি অন্তিমকালে মানুষ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে স্মরণ করে তাদের কাছে সালাম পাঠায়। কিন্তু খোবায়েব (রাঃ) সালাম পৌছালেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে, স্মরণ করলেন রাসূল (সাঃ)-কে। আর এসব সাহাবায়ে কিরামের জীবনের শেষ আকাংখা ছিল দু' রাকাত নামায।

## জান্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর সাথী

হযরত রাবীয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে রাত্রিযাপন করতাম। তাহাজ্জুদের সময় পানি, মিসওয়াক ইত্যাদি পেশ করতাম। একদিন আমার খিদমতে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) বললেন, চাও, যা চাওয়ার আছে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আমি বেহেশ্‌তে আপনার সাথী হতে চাই। রাসূল (সাঃ) বললেন, বস্‌ এতটুকুই? আর কিছু না ? অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তবে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করবে। এ হাদীসের মধ্যে একটি সর্তকবাণী রয়েছে যে, শুধুমাত্র দোয়ার উপর নির্ভর করলে চলবে না। যেমন অনেকের ধারণা যে, অমুক বুজুর্গের দোয়ায় আমি পার পেয়ে যাব। এরূপ ধারণা ভুল। আমরা দুনিয়াবী কাজের জন্য দোয়ার অপেক্ষায় থাকি না, হাজারভাবে চেষ্টা করি, তদবীর করে থাকি। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে তদবীর ও দোয়ার আশ্রয় নেই। চেষ্টা-তদবীর জরুরী মনে করি না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহওয়ালাদের দোয়া অত্যন্ত কার্যকরী, কিন্তু রাসূল (সাঃ) স্বয়ং উক্ত সাহাবীকে শুধু দোয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে সাহায্য করতে বললেন।

# সপ্তম অধ্যায়

## সাহাবীদের দয়া ও পরোপকার

ইসলামে ইসার হল নিজ প্রয়োজনের তুলনায় অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার যে বিধান রয়েছে তার নাম। ইসারের বহু নিদর্শন সাহাবী (রাঃ)-দের জীবনে পাওয়া যায়। তাঁদের সুমহান আদর্শ এতই উচ্চমানের যে তার অনুমান করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এর কিছুটাও যদি আমরা অনুসরণ করি তা আমাদের সৌভাগ্য। সাহাবী (রাঃ)-গণ ইসার অনুশীলনে ছিলেন তুলনাহীন। তাঁদের ঘটনা উপলব্ধি করলে মনে হয় তাঁরা যেন ইসারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁদের এত আকুলতা যে, নিজে না খেয়েও অন্যের জন্যে কষ্ট করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। এ সম্পর্কে তাঁদের মাঝে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্‌ বলেন, "আমি তাদেরই সদগুনের প্রশংসা করছি। কারণ তারা নিজে উপবাস করেও অপরের প্রয়োজনকেই বেশী বড় মনে করে অর্থাৎ নিজে না খেয়েও অপরকে খাওয়ায়।"

## যে ত্যাগের তুলনা হয়না

ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু জাহিম ইব্‌নে হুযাফা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই এর খোঁজে বের হয়েছিলেন। তখন সাথে ছিল এক মশক পানি। মনে করলাম, যদি তাঁকে তৃষ্ণার্ত দেখি তাহলে এ পানি পান করাব। এক স্থানে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম মুমূর্ষু অবস্থায়। তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি তাঁকে পানি দেব কিনা জিজ্ঞেস করলে সে ইশারায় সম্মতি জানাল। এমন সময় কাছেই আর একটি মুমূর্ষু লোক চীৎকার করলেন। তাঁরও মৃত্যু সন্নিকট ছিল। আমার ভাই তাঁর চীৎকার শুনে আমাকে তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি ছিলেন হিশাম ইব্‌নে আবিল আস। আমি তাঁর কাছে পৌছলে পাশে আর একজন সাহাবী মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। এ সাহাবীর ইশারায় আমাকে তাঁর কাছে যাবার অনুরোধ জানালে তাঁর কাছে আমি পৌছে দেখি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ফিরে এসে তখন হিশামের কাছে দাঁড়ালে দেখি তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। সেখান থেকে আমার ভাইয়ের কাছে যখন এলাম তখন তাঁকেও জীবিত পেলামনা। কি অদ্ভূত সহানুভূতি! প্রাণ ওষ্ঠাগত, তৃষ্ণার্ত, মৃত্যু সন্নিকট

জেনেও নিজ প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে অন্যের প্রয়োজন মিটবার জন্যে কি অতুলনীয় ত্যাগই না স্বীকার করলেন। মানবীয় ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

## বাতি নিভিয়ে মেহমানদারী

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে এক সাহাবী হাযির হয়ে নিজের ক্ষুধা, কষ্টের উল্লেখ করলে রাসূল (সাঃ) খাদ্যের খোঁজে বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে জানালেন দেয়ার মত খাবার নেই। তিনি সাহাবী (রাঃ)-গণকে বললেন, 'এ ব্যক্তির মেহমানদারী তোমাদের কেহ কি করতে পার?' একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) বললেন,'ইয়া রাসুলাল্লাহ' আমি তাঁর মেহমানদারী করব।' সাহাবী (রাঃ) লোকটিকে বাড়ী নিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল (সাঃ)-এর মেহমান। যা আছে ঘরে তাই তাঁকে খেতে দাও। স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! শিশুদের খাবার ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।' আনসারী সাহাবী বললেন, ' শিশুদের কোন ক্রমে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরা ঘুমালে খাবারগুলো এনে হাযির কর। আমিও সাথে বসে খাব। বাতি পরিষ্কার করার অজুহাতে খাওয়ার আগে বাতিটি নিভিয়ে দেবে। তারপর অন্ধকারে আমরা খেতে থাকব।' স্ত্রী স্বামীর কথা প্রতিপালন করলেন। মেহমান সকল খাদ্যেই খেলেন আর আনসারী সাহাবী অন্ধকারে না খেয়ে শুধু খাওয়ার অভিনয় করলেন। এভাবে সবাই মেহমানের জন্যে না খেয়ে রাত কাটলেন। এ কাজটি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন, 'যদিও তারা উপবাসী তবুও তারা অন্যের প্রয়োজনকে বেশি বড় মনে করত।'-(সুরা হাশর ঃ ৯)

## রোযাদারের উদ্দেশ্যে বাতি নিভিয়ে দেয়া

অনবরত রোযা রাখার অভ্যাস ছিল এক সাহাবী। ইফতার করার তাঁর কিছু থাকতনা। আনসারী সাহাবী সাবেত বিষয়টি টের পেয়ে স্ত্রীকে বললেন, আজ রাতে একজন মেহমান নিয়ে আসব। তখন খাওয়ার সময় বাতি ঠিক করার অজুহাতে নিভিয়ে দেবে। মেহমানের পেট না ভরা পর্যন্ত আমি কিছুই খাবনা। স্ত্রী সে মতই কাজ করলেন। মেহমান খেতে বসলে তিনিও সাথে শরীক হলেন। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করার কারণে তিনি কিছু খাননি কিছু মেহমান তা জানতে পারলেন না। হযরত সাবেত (রাঃ) সকালে মসজিদে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, গত রাতে 'মেহমানের জন্য তোমার ব্যবহারে আল্লাহ্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন'। -(দুররে মনসুর)





## উটের মাধ্যমে যাকাত আদায়

একবার হযরত উবাই ইব্‌নে কাব (রাঃ)-কে 'রাসূল (সাঃ) যাকাত উসূল করতে পাঠালে এক সাহাবীর কাছে গিয়ে সম্পদের হিসাব করে দেখলেন তাঁকে যাকাত বাবদ এক বছরের একটি উটের বাচ্চা যাকাত বাবদ দিতে হয়।' যাকাত প্রদানকারী সাহাবী বললেন, 'এ দিয়ে কি হবে? এর দুধও খাওয়া যাবে না। সওয়ারও হওয়া যাবে না। তিনি একটি মোটা তাজা অল্প বয়স্ক উটনী এনে বললেন, এটা নিন। আমি বললাম, এটা আমি নিতে পারবনা। হিসাব ব্যতিত অধিক বস্তু গ্রহণ করার আদেশ আমার নেই। তুমি দিতে চাইলে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাও। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন আমার আপত্তি নেই। অমুখ স্থানে তিনি অবস্থান করছেন, চল উট নিয়ে আমার সাথে। আমার কথামত সাহাবী উটনী নিয়ে হযরত রাসূল (সাঃ) -এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার লোক আমার কাছে যাকাত আদায় করতে গিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন লোক আমার কাছে যাকাতের জন্য যান নাই। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমার যাকাতের সামানা সামনে হাযির করলে তিনি হিসার করে একটি এক বছরের উটের বাচ্চা দাবি করলেন। আমি বললাম এক বছরের বাচ্চা কি কাজে আসবে, এতে চড়াও যাবেনা দুধও খাওয়া যাবেনা বলে এজন্যে খুব ভাল একটা উট দিতে চাইলাম । তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। আর এজন্যে নিজেই তা আপনার খিদমতে উপস্থিত করেছি।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তিনি হিসাব করে যা বলেছে তাই তোমার উপর ওয়াযিব। যদি তুমি এর চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু দিতে চাও তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। তোমার এ দানের জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে পুরষ্কৃত করবেন। সাহাবীর এ উটটি রাসূল (সাঃ) গ্রহণ করে দোয়া করলেন তাঁর বরকতের জন্যে।

## দান-খয়রাতের প্রতিযোগিতা

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা, আমাদেরকে একবার রাসূল (সাঃ) সদ্‌কা করতে আদেশ দিলেন। তখন আমার কিছু সম্পদ জমা ছিল বলে ভাবলাম "আজ আবু বকরকে পরাজিত করব যাকাত প্রদান করে। তাঁর চেয়ে বেশি দিয়ে সম্পদের হার মানাব।' এ ভেবে আমার সমুদয় সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্যে কি রেখে এসেছ?" বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিছু রেখে এসেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি রেখে এসেছ? আমি বললাম, অর্ধেক রেখেছি।

এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, কোন সময়ই আমি দান খয়রাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে অতিক্রম করতে পারিনি। সৎ কাজে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য কোরআনে তাকিদ দেয়া হয়েছে। তাবুকের যুদ্ধের সময় সদ্‌কার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) তখন সদ্‌কার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে সকলকে যথাসাধ্য প্রদান করতে ঘোষণা করলে সাহাবী (রাঃ)-গণ সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

## হযরত আমীর হামযার কাফন

রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হযরত আমীর হামযা (রাঃ)। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফেররা তাঁর মৃতদেহের অবমাননা করে তাঁর নাক,কান এবং অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বুক ছিঁড়ে তার হৃদপিন্ড বের করে নিয়ে যায়। যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) এবং অন্য সাহাবী (রাঃ)-গণ শহীদগণের লাশ একত্র করে তাঁদের গোর-কাফণের ব্যবস্থা করছিলেন। রাসূল (সাঃ) নিজের চাচাকে বিকৃত অবস্থায় দেখে খুবই ব্যথিত হয়ে একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) এর আপন বোন হযরত সাফিয়া (রাঃ) নিজের ভাইকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) ভেবেছিলেন নিজের ভাইকে এমন বীভৎস অবস্থায় দেখলে সহ্য করতে পারবেনা। তাই তিনি নিষেধ করলেন।

সেখানে হযরত সাফিয়া (রাঃ) গেলে হযরত যুবাইর (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) আপনাকে লাশের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি শুনলাম কাফেরেরা আমার ভাইয়ের নাক, কান ইত্যাদি কেটে ফেলেছে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় সে শহীদ হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তাঁর নাক, কান সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা গেছে। এ তো খুবই সৌভাগ্যের বিষয়! আমার মনে এতে একটুও কষ্ট হচ্ছেনা বরং আনন্দই হচ্ছে। কাজেই তাঁকে ভয়ানক এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেও সহ্য করতে পারব। শুধু একবারের জন্যে আমাকে তাঁকে দেখতে দাও। তাঁর এ আবেদন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করলে তিনি



হামযা (রাঃ)-কে দেখার জন্যে অনুমতি দিলে নিজের শহীদ ভাইকে দেখে 'ইন্না লিল্লাহ পাঠ করে দোয়া করলেন। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদদের মৃতদেহ যেখানে ছিল সেখানে এক স্ত্রীলোক অতি দ্রুত আসতে দেখে রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-গণকে বললেন, 'দেখ একজন স্ত্রীলোক আসছে। এদিকে আসতে তাকে নিষেধ কর।'

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম আমার মা আসছেন। তখন তাঁকে বাধা দিলে তিনি আমাকে এক ধাক্কায় বললেন, যা সরে যা। আমি তখন বললাম, ওদিকে যাওয়া যাবে না। রাসূল (সাঃ)-এর নিষেধ। এ কথায় হঠাৎ থেমে গেলেন। এরপর দুটি কাপড় বের করে বললেন, ভাইয়ের শাহ্‌দাতের কথা শুনে কাফন নিয়ে এসেছি। নাও, এ কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন দাও। আমরা এ কাপড় দিয়েই হযরত হামযা (রাঃ)-কে দাফন করলাম। পাশেই সোহায়ল নামে একজন আনসারী (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন। কাফেরেরা তাঁকেও বিকলাঙ্গ করেছিল। তাঁর কাফনের জন্যে কোন কাপড় ছিলনা। অথচ হযরত হামযা (রাঃ)-এর ছিল দুখানা কাপড়; তাই একখানা কাপড় এ আনসারীর জন্যে দিয়ে দিলাম। কিন্তু কাপড় দু'খানা সমান ছিলনা। একটি ছিল একটু বড়। কাজেই কাকে কোন কাপড় দেয়া হবে সেজন্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সিদ্ধান্তে ছোট কাপড়টি গিয়ে পড়ল হযরত হামযা (রাঃ)-এর ভাগে । কাফন দেয়ার সময় দেখা গেল এ কাপড়টি দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করা যাচ্ছেনা-মাথা ঢাকলে পা খালি থাকে এবং পা ঢাকলে মাথা খালি থাকে। রাসূল (সাঃ) তখন বললেন, কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দাও এবং পাগুলো ঢেকে দাও লতাপাতা দিয়ে। -(খামীস)

রাসূল (সাঃ)-এর চাচার কাফনের এ অবস্থা। নিজের বোন কাফনের কাপড় দুটি দিলেন তাও শেষ পযর্ন্ত ভাগে পড়ল ছোট কাপড়খানা। মৃতের মাথা ঢাকা হল কাপড় দিয়ে আর পা ঢাকা হল ঘাস-পাতা দিয়ে। এ কাপড়ের ভিতরেও ইসার ও পরোপকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যারা দানশীলতা ও পরোপকারের অহংকার করে থাকে, তাদের এ মহাপ্রাণ, চিরস্বরণীয় সাহাবী (রাঃ)-গণের দৃষ্টান্ত অনুধাবন করা কর্তব্য। সাহাবী (রাঃ)-গণ শুধু বক্তৃতা করেই শেষ করেননি, বরং প্রতিটি কাজ নিজেরা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

## অদ্ভুত সহানুভূতি

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি কোন এক সাহাবী (রাঃ)-কে বকরীর মাথা হাদিয়া স্বরূপ উপহার দিলে তিনি তা তাঁর এক সাথী ভাইকে দিয়ে দিলেন। কারণ তাঁর ভাইয়ের ছিল অনেক লোক এবং অভাবগ্রস্থ। উপহার পেয়ে এ সাথী ভাইয়ের আবার আর একজনের কথা মনে হলে তিনি বকরীর এ মাথাটি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও তা আবার অন্য একজনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং এভাবে সাত বাড়ি পর্যন্ত মাথাটি অতিক্রম করে প্রথম ব্যক্তির কাছে আবারও ফিরে আসে। অপরের অভাবকে প্রত্যেকেই নিজের অভাবের চেয়ে বেশি মনে করে হাদিয়া ফিরিয়ে দিলেন। একেই বলে ইসার। সাহাবায়ে কিরামের প্রায় প্রতিটি কাজেই ইসারের উদাহরণ দেখা যায় এবং তাঁরা প্রায় সকলেই দরিদ্র ছিলেন তাঁরা নিজের অভাবকে অপরের অভাবের তুলনায় সামান্যই মনে করতেন।

## হযরত ওমর (রাঃ) এক মুসাফিরকে সাহায্য প্রদান

হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত যুগে প্রায় রাতেই ছদ্মবেশে এলাকা ভ্রমণ করে জন সাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। একদিন ভ্রমণ করতে করতে এক ময়দানে একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। এ স্থানে তাঁবুটি ইতিপূর্বে ছিলনা। তিনি তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁবুর বাইরে একটি লোক বসে রয়েছে আর তাঁবুর ভিতর কার জানি কাতর ধনি শোনা যাচ্ছে। লোকটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? লোকটি উত্তর দিল; আমি মুসাফির, গ্রামে থাকি খলিফার কাছে নিজের দুঃখ-অভাব জানতে এসেছি। দেখি সাহায্য পাওয়া যায় কিনা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তাঁবুর ভিতর হতে কিসের শব্দ আসছে? লোকটি বলল, শুনে কি হবে তোমার? বরং তুমি তোমার নিজের কাজে যাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না, বল। কার যেন কষ্ট হচ্ছে! লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে কি অন্য কোন স্ত্রীলোক আছে? লোকটি বলল, না, আর কেহ নেই।

একথা শোনার পর হযরত ওমর (রাঃ) সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে বললেন, একটা বড় রকমের সওয়াবের কাজ ঠিক করে তোমাকে সাথে নিতে এসেছি। এক্ষুণি চল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ বলবেন কি? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, গ্রামের একটি অতি দরিদ্র স্ত্রীলোক ময়দানে পড়ে প্রসাব-ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তার সাথে কোন স্ত্রীলোক নেই। হযরত



উম্মে কুলসুম (রাঃ) শুনে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে বললেন, আপনার আদেশ পেলে আমি এখনই তৈরী হয়ে নিচ্ছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, দেরী নয়, এখনই তৈরী হয়ে নাও। আর প্রসবের সময় যা দরকার তাও সাথে নিতে ভুলনা।

তাঁরা আবশ্যকীয় সকল জিনিস পত্র সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে হেঁটে তাঁবুর কাছে গিয়ে হযরত উম্মে কুলসুম তাঁবুর ভিতরে যেতে বললেন। হযরত ওমর(রাঃ) নিজে রান্না শুরু করলেন। এ সময় মহিলার প্রসব সম্পন্ন হয়ে গেল। ভিতর থেকে হযরত উম্মে কুলসুম হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমীরুল মুমেনীন! সুসংবাদ দিন আপনার বন্ধুর ছেলে হয়েছে। আমিরুল মুমেনীন কথাটি লোকটি শুনে অত্যন্ত ভীত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, ভয়ের কিছু নেই । এ নাও, হাড়িটা প্রসূতিকে এ থেকে খাবার খেতে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) এ লোকটিকে হাঁড়ি থেকে খাবার খেতে বললেন। সমস্ত রাত তুমি জেগে কাটিয়েছ। এখন শুয়ে পড়। আমার কাছে কাল সকালে এস। তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেব।

বর্তমান কালের রাষ্ট্রনায়কগণ তো দূরের কথা, মামুলি ধরণের যে ধনী কয়জন আছেন–যে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে একজন অসহায়া দরিদ্র স্ত্রীলোকের প্রসবে সাহায্য করতে যাবে? এমন কয়জন দয়ালুই বা পাওয়া যাবে যে, নিজের বাড়ী থেকে চাল-আটা বহন করে নিয়ে একজন অজানা মুসাফিরকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করবে? মালদারের কথা বাদ দিয়ে কয়জন দিনদার পাওয়া যাবে যে, এতটুকু ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার করবে? আমাদের বুঝা উচিত যাঁদের দোহাই দিয়ে আমরা বরকত হাসিল করতে চাই, তাঁদের শুধু কথা নয়, তাঁদের জীবনাদর্শ কিছুটা অনুসরণ করা আমাদের একান্তভাবেই প্রয়োজন।

## হযরত আবু তালহার বাগান দান

মদীনায় তখন সকলের চেয়ে বেশী বাগান ছিল আবু তালহা আনসারী (রাঃ)-এর। বীরেহা নামের একটি অতি সুন্দর বাগানকে তিনি ভালবাসতেন। মসজিদে নববীর সন্নিকটে এ বাগানটি ছিল এবং তাতে প্রচুর পানি ছিল। হযরত রাসূল (সাঃ)-এর উপর যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল–"যে পর্যন্ত তুমি তোমার প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্‌র জন্যে) খরচ করতে না পারবে সে পর্যন্ত তোমরা নেকী লাভ করতে পারব না।" এ সময় আবু তালহা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমার বীরেহা বাগানটি আমার সকল বস্তুর থেকে উত্তম। আল্লাহ্ প্রিয়তম বস্তুই চান। কাজেই বীরেহা বাগানটি আমি

আল্লাহ্‌র নামে সদ্‌কা দিলাম। রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, এটা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ তাই এটা তুমি তোমার নিজের লোকদের লোককে বন্টন করে দাও। বাগানটি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে হযরত তালহা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। -(দুররে মানসুর)

ওয়াজ বা কোরআনের নসীহত শুনে বা পাঠকরে আমরাও কখনো কখনো দান করার সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু বিশেষ ধরনের কোন সদ্‌কা খয়রাতের কথা উঠলে চিন্তা করতে থাকি কেমন করে একে বাদ দেয়া যায়। যদি একটা পথ আবিষ্কৃত হয় তাতে খুশি হয়ে যাতে জীবনে কিছু খরচ করতে না হয় সে চেষ্টাই করি। তারপর মৃত্যুর পরে আমাদের ধন-সম্পদের যা কিছু হবার তাই হয়। আমরা নিজেরাই এর বিশেষ উপকার পাইনা। কিন্তু সুনামের জন্যে কিংবা বিবাহ-শাদীতে আমরা সুদের বিনিময়ে ধার করে খরচ করতে দ্বিধাবোধ করিনা। শুধু দান-খয়রাত ও সদ্‌কার বেলায়ই আমাদের যতসব বাঁধা-বিপত্তি। আমরা তখন টাকা খরচ না করার জন্যে কত মাসয়ালা-মাসায়েল বের করি।

## হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) এর দানশীলতা

তিনি ছিলেন একজন সু-প্রসিদ্ধ ধন-সম্পদ মোহ বিবর্জিত সাহাবী। দুনিয়াতে তাঁর কোন ধন-সম্পদের মোহ ছিলনা এবং সম্পদ কখনো জমা রাখতেন না। কেহ জমা রাখুন এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি ত্যাগী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সম্পদশালী লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন। এ জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আদেশে তিনি রাবাদাহ নামক এক জঙ্গলে এসে বাস করতেন। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর কয়েকটি উট ছিল। অতি বৃদ্ধ একজন লোক সেগুলো রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন। একদিন সোলায়মান গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আপনার খিদমতে থেকে আপনার বৃদ্ধ রাখালের সাহায্য এবং আপনার সেবা করব। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বললেন, যে আমার হুকুম মানে সেই আমার সেবাকারী ও বন্ধু। লোকটি বললেন, কিরূপ কাজ করে আমি আপনার সেবা করতে পারি? তিনি বললেন, আমি যখন আমার ধন-সম্পদ খরচ করতে চাই তখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে খরচ করতে হবে এতে কোন দ্বিধা চলবেনা। লোকটি রাজী হয়ে তাঁর কাছে অবস্থান করতে থাকতে লাগলেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, হুযূর কিছু গরীব লোক অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে, এদের খাওয়া পরার কোন সঙ্গতি নাই। এ কথা শুনে হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) সোলায়মান গোত্রের লোকটিকে বললেন, একটা উট নিয়ে এস। লোকটি একটি উত্তম ও মোটাতাজা উট দেখতে পেয়ে ভাবলেন এতো অতি কাজের উট। এ দিয়ে মনিবের কাজ সমাধা হবে।



প্রতিজ্ঞা অনুসারে এ উটটিই তিনি নিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভবলেন, গরীব লোকরা খাবে, এত ভাল উট নিলে আমানতের খিয়ানত হবে। তাই বাধ্য হয়ে দূর্বল উটটি আনতে বাধ্য হলাম। লোকটির অবস্থা বুঝতে পেরে আবুযর গিফারী (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন দু'জন কি কেহ আছেন যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু কাজ করতে পারেন? তখন দু'ব্যক্তি দাঁড়ালেন। তখন হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) তাদেরকে বললেন, এ উটটি নিয়ে জবাই করে সমান ভাগ করে দিন। এদের প্রত্যেককে যত খানি দিবেন আমাকেও ততখানি দিবেন।

লোক দু'টি কাজ সমাধা করল। এরপর আবুযর (রাঃ) সোলায়মান গ্রোত্রের লোককে বললেন, যদি তুমি আমার ওসিয়ত ইচ্ছা করে বা ভুলে গিয়ে ভঙ্গ করে থাক তবে ক্ষমা পাবে। লোকটি বললেন, হুযুর ভুলে এরূপ করি নাই। প্রথমে আমি উত্তমটি আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, এটা অতি কাজের, আপনার প্রায়ই দরকার হবে, ভেবে রেখে এসেছিলাম।

হযরত আবুযর (রাঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এটাই দরকারের দিন, যেদিন আমাকে কবরের ভিতর কীটের আহাররূপে ফেলে দেয়া হবে। -(দুররে মনসুর)।

সম্পদের তিনটি অংশীদার। প্রথমতঃ তকদীর, যা ভাল-মন্দ সকল প্রকার সম্পদ কারো অপেক্ষা এবং কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ ওয়ারিশ, যারা পিতামাতার জন্যে অপেক্ষা করে এবং তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই সমুদয় মাল-সম্পদ ভাগ করে নিয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সম্পদশালী নিজে। যদি শক্তি ও সুযোগ থাকে তাহলে এসকল অংশীদারের মধ্যে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়েও এবং নিজের অংশ নিজে জোর করে খরচ কর । কারণ কখন যে মৃত্যু এসে তোমাকে নিয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে যত বেশী পার নিজের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে পরকালের জন্যে পূণ্য সঞ্চয় কর। তোমার সম্পদ অন্যের অধীনে গেলে তোমাকে আর কে জিজ্ঞেস করবে। কে নিজের ভোগ-বিলাস আমোদ-আহলাদ ত্যাগ করে তোমার কথা স্মরণ করে তোমার মুক্তির জন্য পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে? তুমি তখন একান্ত অসহায় থাকবে, ওয়ারিশগণের উদাসীনতা দেখে তুমি তাদেরকে কিছুই বলতে পারবে না। তাদের হাত হতে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে তো তুমিত আর কবর হতে উঠে আসতে পারবে না। সুতরাং সময় থাকতে নিজের পাথেয় নিজে ঠিক করে নিজের সম্পদ নিজের হাতে ব্যয় করে

পরকালের পাথেয় সঞ্চয় কর। হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, মানুষ বলে থাকে, আমার সম্পদ, আমার মাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই সম্পদ যা সে খেয়ে ফেলে এবং খরচ করে অথবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে আখিরাতের সঞ্চয় করে। তাছাড়া যা কিছু বাকি থাকে তা তো সবই পরের সম্পদ। পরের জন্যেই তুমি জমা করে রেখে যাও। আর একটি হাদীসে আছে, রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-গণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের সম্পদের চাইতে নিজের ওয়ারীশ, সম্পদের বেশী ভালবাস?সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কে থাকবে যে নিজের সম্পদের চেয়ে পরের সম্পদকে বেশী ভালবাসে? রাসূলে মাকবুল (সাঃ) বললেন, এটাই শুধু নিজের সম্পদ যা তোমরা খরচ করে পরকালের জন্যে জমা করে যাও। আর যা মৃত্যুর সময় ত্যাগ করে যাও তাই তোমাদের ওয়ারিশগণের সম্পদ। -(মিশকাত)

## হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিবের অবস্থা

হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিব (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই ছিলে। এ বংশের সকলেই দানশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যে সু-প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হযরত যাফর বিশেষ করে গরীবদের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে ভাল বাসতেন। তিনি কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রথম হাবশ দেশে হিযরত করলে সেখানেও তাঁর অনুসরণ করে। ফলে হাবশের বাদশাহর কাছে তাঁর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি হাবশ হতে ফিরে মদীনায় হিযরত করেন এবং মুতার জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সাঃ) সমবেদনা প্রকাশার্থে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর পুত্রগণকে ডেকে অনেক সান্তনা দান ও উপদেশ প্রদান করেন। হযরত যাফরের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্‌, হযরত আওয়ান পিতার পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। তবে হযরত আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে দানশীলতা বিশেষভাবে সু-প্রসিদ্ধ ছিল বলে তাঁর উপাধি ছিল 'কুতবুস সাখা' অর্থাৎ দানশীলতার কুতুব। সাত বছর বয়সে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফরকে দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলেন এতে লোকটির কার্যসাধিত হয়। লোকটি খুশি হয়ে নজরানা স্বরূপ চল্লিশ হাজার দিরহাম তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফর এটা ফেরত দিয়ে বললেন, আমরা নেকী বিক্রয় করিনা। অন্য এক সময় এক স্থান থেকে দু' হাজার দেহারম, তাঁর কাছে নজর স্বরূপ পাঠান হলে তিনি তা সদ্‌কা করে দিয়েছিলেন।



এক ব্যবসায়ী প্রচুর চিনি নিয়ে বিক্রয় করতে আসে। কিন্তু কেহই সে চিনি কিনতে আগ্রহী না হওয়াতে ব্যবসায়ী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন যাফর নিজের কর্মচারী দ্বারা সমস্ত চিনি কিনে বিনামূল্যে লোকদের মাঝে বিতরণ করে দেন। হযরত যুবায়ের (রাঃ) এক জিহাদে গিয়ে পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় আজ আমি শাহাদাতবরণ করব, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। যেদিন এ অসিয়ত করেছিলেন সে দিনই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। পিতার অসিয়ত অনুসারে সমুদয় ঋণ ছিল বাইশ লাখ দেরহাম ছিল। এ ঋণ নিজের জন্যে করেননি, ঘরের জন্যে করেছিলেন। তাঁর কাছে লোকেরা টাকা গচ্ছিত রাখলে বলতেন, আমার টাকা রাখবার জায়গা নেই। আমি এ সমস্ত টাকা খরচ করব। তোমাদের যখন দরকার চেয়ে নেবে। তিনি পুত্রকে আরো অসিয়ত করেছিলেন, যখন কোন বিপদ আসবে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণাপন্ন হবে। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, যখন কোন জটিল ও শক্ত জিনিস আমার সামনে আসত, তখন আমি বলতাম, হে আমার রব, আমার এ কাজটি সমাধা হচ্ছে না। তখনই আমার উদ্দিষ্ট কাজের ফায়সালা হয়ে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যুবায়ের বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফরকে বললাম, তোমার পিতা আমার পিতার কাছ থেকে দশ লাখ দেরহাম ঋণ করেছিলেন। তাঁর ঋণের তালিকায় আমি তা দেখতে পেয়েছি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, যখন খুশি নিয়ে যেও। একটু পরে আমার ভুল ভাঙ্গল। আমি পুনরায় তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, এ ঋণ তো আমার পিতার। তিনিই এ টাকাটা তোমার পিতার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। আমি বললাম, আমি মাফ চাই না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি যখন পার পরিশোধ কর। আমি বললাম, এর পরিবর্তে আমার কিছু জমি নিয়ে যাও। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আচ্ছা তাই দাও। আমি তাঁকে অতি সাধারণ একখন্ড জমি দিয়ে দিলাম। তাতে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে অনুর্বর ছিল। তিনি এ জমি গ্রহণ করে তার গোলামকে জমির উপর যায়নামায বিছিয়ে দিতে আদেশ দিলেন এবং এর উপর দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তিনি অনেক্ষণ পর্যন্ত সিজদাবনত রইলেন। নামায শেষে গোলামকে বললেন, এ স্থানটি খনন কর। গোলাম খুঁড়তে আরম্ভ করলে তখন দেখা গেল সেখান থেকে একটি পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। -(উসদুল গাবা)।

# অষ্টম অধ্যায়

## বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

মানুষের যত চিন্তা-ভাবনা, ভয়, দুর্বলতা সবই বেঁচে থাকার জন্যে। মানুষ যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন তার কোনরূপ দ্বিধা থাকেনা। লক্ষ্য পথে পৌঁছার জন্য তখন সে সব কিছুই করতে পারে। এ অবস্থায় তার ধন-সম্পদ, লোকজন সব কিছুর প্রতিই বিমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবি বলেন, "যে ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করে সে যা খুশি তাই বলতে পারে।"

## দু'জন সাহাবী (রাঃ)-এর আকাংখা

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ জাহস ওহুদের যুদ্ধে হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বললেন, চল ভাই আমরা একত্রে দোয়া করে। প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মোতাবেক দোয়া করে আমীন বলব। এরূপ করলে আমাদের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাই অত্যধিক আর দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় এখনই। উভয়ে এক জায়গায় বসে এরূপ সিদ্ধান্তে দোয়া করলেন। হযরত সায়দের আবেদন হে আল্লাহ্, আগামীকাল যুদ্ধে আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে এমন একজন যোদ্ধা সু-নির্দিষ্ট কর যে আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে আর আমিও ভীষণভাবে তাকে প্রতি আক্রমণ করে পরাজিত ও হত্যা করে এবং তার ধন-সম্পদ আমি গ্রহণ করি। হযরত আবদুল্লাহ্ 'আমীন' বললেন তাঁর দোয়া শুনে। এরপর আবদুল্লাহ্ বিন জাহস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আগামী কাল যুদ্ধে আমার সামনে একজন বীর যোদ্ধাকে উপস্থিত কর যে আমাকে প্রচন্ড আক্রমণ করবে এবং আমিও তাকে অনুরূপ করব। সে যেন আমাকে শহীদ করে নাক, কান কেটে দেয়। সেদিন কিয়ামতে তোমার সামনে উপস্থিত হব, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আবদুল্লাহ! তোমার নাক, কান কেন কাটা কেন? আমি উত্তরে বলব হে আল্লাহ্! তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়েই এরূপ হয়েছে। তাঁর দোয়ায় হযরত সায়াদ 'আমীন' বললেন। পরের দিন যুদ্ধে উভয়ের দোয়া অনুসারেই তাঁদের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। -(খামীস)

হযরত সায়াদ (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহসের দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম ছিল। তাঁকে সন্ধ্যার সময় দেখলাম শাহাদাতবরণ অবস্থায় তিনি একস্থানে নাক, কান কাটা অবস্থায় পড়ে আছেন। যুদ্ধে তাঁর হাতের তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁর হাতে একটা গাছের ডাল দিলে এটাই তলোয়ারের মত কাজ করছিল। যুদ্ধের পরেও বহুদিন পর্যন্ত এ ডালটা বর্তমান ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছিল তা দু'শত দিনারে। -(ইসাবা)



লক্ষ্য পথে পৌঁছার জন্য শহীদ হওয়ার আকুল আকাঙ্খায় দুনিয়ায় সকল প্রকার অপমান ও অত্যাচার বরণ করে নেয়ার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। জিহাদে শুধু যোগদান করেই সাহাবীগণ গাজী নামের গৌরব লাভ করতে চাননি বরং তাঁরা কঠোর যুদ্ধ করে বীর যোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে আকাঙ্খা করেছেন। জিহাদে হযরত সায়াদ অংশগ্রহণ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি শক্তিশালী যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করতে আকাঙ্খা করেছিলেন। তিনি গাজী হতে চাননি, প্রবলতম শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মৃতদেহের উপর অপমান ও অত্যাচার গ্রহণ করে আল্লাহ্ প্রেমের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে জগতবাসীর কাছে ধন্য হয়েছেন। এমন অভূতপূর্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কটি পাওয়া যাবে?

## যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের প্রথম অংশগ্রহণ

যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মনোবল অব্যাহত রাখার এবং সমরসঙ্গীত গাওয়ার জন্য মহিলাদেরকেও যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার প্রচলন অরবদের মধ্যে থাকলেও ৩রা হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধেই সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওহুদ ময়দানে কোরায়েশ-কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলমানদের শাহাদত এবং যুদ্ধের তীব্রতার সংবাদ মদীনায় এসে পৌঁছলে মুসলিম মহিলারা তা সহ্য করতে না পেরে অভিলম্বে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) আহত নবীর মুখমণ্ডল থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে দিতেন। হযরত সফিয়া বিনতে আবদুল্ল মুত্তালিব তাঁর ভাই হযরত হামযা (রাঃ)-এর লাশ দেখে ইন্নালিল্লাহহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। স্বামী হযরত মুসআব (রাঃ) ইবনে ওমাইরের লাশ দেকে হযরত হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহশ এর মুখ থেকে সহসা চিৎকার বেরিয়ে আসে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কোন কোন আনসার মহিলা নিজেদের শহীদদের লাশের পাশে বসে পড়েন। সত্যি এটি ছিল এক মর্মান্তিক দৃশ্য; একদিকে দূর দুরান্ত পর্যন্ত ওহুদ ময়দানে মুসলিম মুজাহিদদের ৭০ টি লাশ বিক্ষিপ্ত পড়েছিল অপরদিকে আহত মুজাহিদরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন আর মহিলারা তাদেরকে পানি পান করাতেন, তাদের জখমে পট্টি বাঁধতে এবং অন্যান্য পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন।

## ওহুদের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব

মুসলমানদের ওহুদ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস পাঠকমাত্রই কিছুনা কিছু অবগত আছেন। রাসূল (সাঃ)-এর শুধুমাত্র একটি আদেশ অমান্যের কারণে

মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। একটিমাত্র ভুলের কারণে বিজয়ী মুসলমানরা হঠাৎ চারদিক থেকে অতর্কিত শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে বহু সহাবী শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেক সাহাবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) একদল কাফির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে তখন এ কথাও প্রচার হয়েছিল যে রাসূল (সাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন। এ হৃদয় বিদারক সংবাদের সাহাবীগণ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত অবস্থায় অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেন। অনেকেই পলায়নের পথ খুঁজেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন, যখন মুসলমানদেরকে কাফিররা ঘিরে ফেলল, তখন আমি তাঁকে সর্ব প্রথম জীবিতদের মধ্যে অনুসন্ধান করে না পেয়ে আমি শহীদদের কাতারে তাঁকে অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে ভাবলাম, এমনও তো হতে পারে তিনি পলায়ন করেছেন। তাহলে হয়ত আমাদের গুনাহর জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তখন আমি তরবারি হাতে কাফেরদের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রচন্ডভাবে তাদেরকে আক্রমণ করতে থাকি। আর এ আক্রমণে তারা পিছন হটতে শুরু করে। এমন সময় নজর পড়ল রাসূল (সাঃ)-এর উপর। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়ে অনুসরণ করলাম, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের সাহায্যে তাঁর হাবীবকে রক্ষা করেছেন। আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে যাওয়ার মাথে সাথেই একজন কাফের আমাকে 'আক্রমণ' করতে আসে। তিনি (সাঃ) তখন আমাকে বললেন, আলী, একে বাধা প্রদান কর। আমি একাই এর সম্মুখীন হলে আমার আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হল আর কেহ কেহ নিহত হল। অন্য একদল কাফের রাসূল (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে তিনি (সাঃ) এবারও আমাকে বললেন, আলী! এদেরকে প্রতিহত কর। আমি একাই তাদের সম্মুখীন হলে কাফেররা জীবনের মায়ায় পালিয়ে গেল। এমন সময় রাসূল (সাঃ) ওহীপ্রাপ্ত হলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও সাহায্যের প্রশংসা করলেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "নিশ্চয়ই আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে।" হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এ কথা শুনে বললেন এবং আমি আপনাদের উভয় থেকেই। -(কুররাতুল আইন)

রাসূল বিহীন জীবনের কোন সার্থকতা নাই। রাসূল (সাঃ) না থাকলে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? এ কথা মনে করে হযরত আলী (রাঃ) শুধু শহীদ হবার



লক্ষ্যে শত্রুদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-কে যখন তিনি জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন কি আনন্দ তার মনে প্রাণে! কত আকুল হয়ে কত উদ্ভ্রান্ত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন রাসূল (সাঃ)-এর সন্নিকটে। আবার রাসূল (সাঃ)-এর আদেশে তাঁকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ, সাহস ও বীরত্ব দেখে আল্লাহ্ কতই না প্রশংসা করলেন।

সাহাবী জীবনের এটিই ছিল প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যেই জীবন ধারণ করতেন। নিজেদের স্বার্থের কিংবা দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য তাঁরা এক মুহূর্তেও বেঁচে থাকার চিন্তা তাঁদের মনে কখনো উদয় হয়নি।

## যে সাহাবী (রাঃ)-কে গোসল দিলেন ফেরেশ্তারা

নতুন বিয়ে করার কারণে ওহুদ যুদ্ধে হযরত হানযালা (রাঃ) প্রথম দিকে যোগদান করেননি। নববধূর সাথে রাত যাপন করার এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এ সংবাদ তিনি আর সহ্য করতে না পেরে নাপাক অবস্থায়ই তলোয়ার হাতে নিয়ে ওহুদ প্রান্তরে অগ্রসর হয়ে সোজা শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাতবরণ করেন। শরীর নাপাক থাকলেও বিনা গোসলেই শহীদকে দাফন করা চলে। হযরত হানযালাকে বিনা গোসলেই দাফনের আয়োজন করা হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন ফেরেশতাগণ হযরত হানযালাকে গোসল করাচ্ছেন। আর এ কথা তিনি সাহাবী (রাঃ)-গণকেও জানিয়েছিলেন। আবু সাঈদ সায়াদী বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সংবাদ শুনে হযরত হানযালাকে দেখলাম তাঁর চুল থেকে পানি ঝরে পড়ছে। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সাঃ) হযরত হানযালার সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তিনি সেদিন নাপাক আবস্থায় যুদ্ধে গিয়েছিলেন। -(কোররা)

বীরের উপযুক্ত যুদ্ধের দামামা, জিহাদের ডাক এবং রাসূলের প্রেম তাঁকে আত্মভোলা করে তুলবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? হযরত হানযালা সত্যিকার বীর এবং রাসূল প্রেমিক ছিলেন। তাঁর শিরায় শিরায় শাহাদাতের রক্ত প্রবাহিত হত। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয়ে রাসূল (সাঃ) শত্রুর কবলে পড়েছেন- এ সংবাদ পেয়ে তিনি কেমন করে গোসল করার জন্য অপেক্ষা করবেন? একেই বলে রাসূলের প্রতি রাসূল প্রেমিকের ভালবাসা ও সুমহান আত্মত্যাগ।

## হযরত আমর ইব্‌নে জুমূহ (রাঃ)-এর আকাঙ্খা

হযরত আমর ইব্‌নে জুমূহ (রাঃ) চার পুত্রের জনক এবং তিনি ছিলেন খোঁড়া। তাঁর পুত্রগণ অধিকাংশ সময় হযরত রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন এবং জিহাদে শরীক হতেন। ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে হযরত আমর ইব্‌নে জুমূহ (রাঃ)-এর প্রবল বাসনা ছিল। লোকেরা বললেন, আপনি অসমর্থ, হাঁটতে পারেন না, আবার যুদ্ধে যাবেন কি করে? তিনি বললেন, বড়ই দুঃখের কথা যে আমার ছেলেরা জান্নাতে যাবে আর আমি যেতে পারব না। তাঁর স্ত্রী বিদ্রুপ করে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমার স্বামী যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছেন। তিনি এ সমস্ত কথা শুনে তরবারী হাতে পবিত্র কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনোনা।

এরপর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে গিয়ে হাযির হয়ে নিজ পরিবার-পরিজনের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এবং নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমি খোঁড়া বলেই পায়ে হেঁটে জান্নাতে যেতে চাই, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ যেহেতু তোমাকে পঙ্গু করেছেন জিহাদে না গেলেই কি ক্ষতি হবে? তিনি পুনরায় নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি আমর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় বলছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জান্নাত লাভের আশা করি। তাঁর এক পুত্রও তাঁর সাথী হলেন। পিতা-পুত্র উভয়ের জিহাদের ময়দানে শাহাদতবরণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী নিজ স্বামী ও পুত্রের লাশ উটের পিঠে করে মদীনায় আনতে চাইলেন কিন্তু উটটি হঠাৎ বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও উটকে উঠানো আর সম্ভব হলনা। অবশেষে বহু চেষ্টার পর যখন তাকে খাড়া করা হল তখন সে ওহুদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমরের স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-কে এ ব্যাপারে অবগত করালে তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, এরূপ করার জন্য তো উটটিকে হুকুম দেয়া হয়েছে। আমরের অন্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে! এরই নাম জান্নাতের আকাংখা আর এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য প্রকৃত ভালবাসা। এ প্রেমের ঢেউ মৃত্যুর পরও শেষ হয়না। হযরত আমর (রাঃ) জীবনে যা আকাঙ্খা করেছিলেন, ঐকান্তিক ভাবে যা কামনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় উটও তাঁর আকাঙ্খা পূরণে সহায়তা করেছিল।



## হযরত মুসয়াব ইব্‌নে উমায়েরের শাহাদত

পারিবারিক সূত্রেই হযরত মুসযার ইব্‌নে উমায়ের (রাঃ) ছিলেন সম্পদশালী। তিনি অতি সুখ-স্বচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দর সুঠামদেহি যুবক। পিতা তাঁকে বহুমূল্যবান পোশাক পরাতেন। সম্পদশালী পরিবারের সন্তান বিধায় জীবনে আরাম-আয়েশ পূর্ণমাত্রাই তিনি ভোগ করেছিলেন। ইসলাম প্রচারে প্রথমেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে বাড়ির লোকজন বন্দী করে রাখে। এভাবে কিছুদিন বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হন। একদিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে হাবশে হিযরতকারী মুসলমানদের সাথে মিলিত হন। সেখান থেকে ফিরে মদীনায় হিযরত করেন এবং নিতান্ত দারিদ্র্যের মত জীবন-যাপনে অভ্যাস্ত হয়ে পড়েন। তার এ অবস্থা দর্শনে রাসূল (সাঃ) ব্যথিত হলেন। তিনি উমায়রের গায়ে একটি জীর্ণশীর্ণ চাদর দেখতে পেয়েছিলেন। এটি কয়েক জায়ায় ছিন্ন এবং তালি দেয়া ছিল। তাঁর অতীত এবং বর্তমান অবস্থা চিন্তা করে রাসূল (সাঃ)-এর চোখে অশ্রু এসেছিল।

ওহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসাইয়াবের হাতে ছিল। যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটায় মুসলমানরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করেছিলেন তখন তিনি এক জায়গায় পতাকা হাতে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন এক কাফেরের কাছে এসে তরবারির আঘাতে তাঁর ডান হাতটি কেটে দেয়, তিনি তখন বাম হাতে পতাকা ধারণ করলে কাফিরটি তাঁর সে হাতটিও কেটে ফেলে। তিনি উভয় বাজু ও বুকের সাহায্যে পতাকাটি চেপে ধরে রাখেন অথচ কোন ক্রমেই পতাকা মাটিতে পড়তে দিলেন না। কাফেরটি তখন তাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় শাহাদতবরণ করেন। দাফন করবার সময় দেখা গেল তাঁর সাথে একটি চাদর আছে এবং তাও এত ছোট যে তাঁর শরীর ঢাকা যায় না। মাথা ঢাকলে পা খালি থাকে আর পা ঢাকলে মাথা খালি থাকে। এটি দেখে রাসূল (সাঃ) বললেন, চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে দাও এবং গাছের পাতা দিয়ে পা ঢেকে দাও। সীমাহীন সুখে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তিম জীবন ছিল এ রকম। তিনি দুনিয়া চাননি। দুনিয়ার সুখ শান্তি, তাঁর কাম্য ছিলনা। পরকালের, সুখ-শান্তির জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে কাম্য বস্তু লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। যাঁরা সত্যিকার মুসলমান পরকালের আশায় দুনিয়ার সকল কিছুই বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

## হযরত সায়াদ (রাঃ)-এর প্রতি খলিফার অসিয়ত

হযরত ওমর (রাঃ) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। ইরাকের যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করবার আলোচনায় হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাসের নাম উল্লেখিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন আরবীয়দের অন্যতম। তাই সবাই তাঁকেই মনোনীত করলে ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া হল। যখন তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে কাদেসিয়া আক্রমণ করতে গেলেন, তখন পারস্যের বাদশাহ বিশ্ববিখ্যাত রুস্তমকে তাঁর মোকাবেলা করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রুস্তম যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে নানা অজুহাতে বাদশাহকে জানালেন যে, তিনি রাজধানী থেকেই সৈন্যদলকে পরিচালনা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সৈন্যদলকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করলেন।

হযরত সায়াদ যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে এ অসিয়ত করলেন যে, হে সায়াদ! এ কথায় যেন তুমি ধোকায় না পড় যে তুমি একজন সাহাবী এবং রাসূল (সাঃ)-এর মামা। আল্লাহ্ অপবিত্র দ্বারা অন্য কোন কিছুকে পরিশুদ্ধ করেন না। বরং পবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্র কে ধৌত করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দার বন্দেগীই শুধু গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র কাছে সকলেই সমান। সকলেই তাঁর বান্দা এবং তিনি সকলেরই প্রভু। তাঁর কাছে থেকে পুরস্কার লাভ করতে হলে তা শুধু ঐকান্তিক গোলামীর সাহায্যেই সম্ভব। প্রতিটি শব্দে রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ আনুগত্য করাই আমল করার বস্তু। তুমি আমার উপদেশ স্মরণ রাখ যে, তোমাকে একটা কাজের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। এর সাফল্য নির্ভর করবে শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের উপর। নিজকে এবং নিজের সঙ্গীদিগকে সৌন্দর্য,পবিত্রতা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। দু'টি বস্তুর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় লাভ হয়। আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকায়। -(আশহা)

এ উপদেশ পাওয়ার পর মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করে হযরত সায়াদ (রাঃ) রুস্তমের মোকাবেলায় সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

## ওহুদ যুদ্ধে হযরত ওয়াহাব ইব্‌নে কাবুসের শাহাদত

হযরত ওয়াহাব ইব্‌নে কাবুস (রাঃ) ছিলেন একজন গ্রাম্য সাহাবী। তিনি গ্রামে বাস করে ছাগল চরাতেন। একদিন নিজের ছাগলগুলো ভ্রাতুষ্পুত্রের ছাগলের সাথে রেখে তিনি মদীনার দিকে চলে গেলেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে রাসূল (সাঃ) ওহুদ গমন করেছেন। একথা শুনে তিনি ওহুদের





যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে, দেখা করলেন। ঠিক এ সময়ে একদল কাফের রাসূল (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, 'যে লোক এ লোকদেরকে তারিয়ে দিতে পারবে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে।' হযরত ওয়াহাব (রাঃ) একথা শুনে অতিদ্রুত তাদের উপর তরবারির আক্রমণ চালাতে লাগলেন এবং এতে কাফেরেরা পালাতে বাধ্য হল। পুনরায় একদল এসে রাসূল (সাঃ)-এর উপর আক্রমণোদ্যত হলে রাসূল (সাঃ) এবারও একই উক্তি করলেন। হযরত ওয়াহাব (রাঃ) এবারও লোকগুলোকে হটিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে হযরত ওয়াহাব (রাঃ) তাদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করলেন।

হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওয়াহাবকে আমি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখেছি এমন আর কাউকে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি রাসূল (সাঃ)-কে হযরত ওয়াহাবের শিয়রে দাঁড়ান অবস্থায় দেখলাম। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট, আমিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর তিনি (সাঃ) তাঁকে নিজ হাতে দাফন করেন। ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওয়াহাবের আত্মত্যাগ দেখে আমি খুবই আশ্চার্যন্বিত হয়েছিলাম, এমন আর কারো ত্যাগে এরূপ হইনি। তাঁর ন্যায় আমল নিয়ে যদি আমি আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারতাম। -(ইসাবা ও কুরবা)

## বীরে মাওনার যুদ্ধ

একটি সু-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হিসাবে বীরে মাওনাকে ইতিহাসের পাতায় অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীর একটি দল শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। এ দলের সকলেই হাফেযে কোরআন ছিলেন। এ দলকে বলা হত 'কোরা' অর্থাৎ কোরআন বিশেষজ্ঞ দল। এ দলের কয়েকজন মুহাজির ব্যতীত আর সকলেই ছিলেন আনসার। এ দলটিকে রাসূল (সাঃ) অতিশয় ভালবাসতেন। কারণ তাঁরা রাতে যিকর এবং কোরআন পাঠ করতেন। তা ছাড়া দিনে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর নানা কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতেন। নজদের অধিবাসী আমের ইব্‌নে মালেক দলটিকে তাবলীগ করাবার অজুহাতে নিজ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সাঃ) দ্বিধাবোধ করে বলেছিলেন, আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার সাহাবীদের কোনরূপ বিপদ ঘটে। কিন্তু এ লোকটি রাসূল (সাঃ)-কে অনেক সান্ত্বনা দেয়ায় অবশেষে তিনি সাহাবীদেরকে তার সাথে যাবার

অনুমতি প্রদান করেন। তাঁদের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রাসূল (সাঃ) আমের ইবনে তোফায়েলকে একটি পত্রে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সাহাবীদের এ দলটি যখন মদীনা অতিক্রম করে বীরে মাওলা নামক স্থানে এসে উপনীত হন। তাঁদের মাঝে দু'জন ব্যক্তি হযরত ওমর ইব্নে উমাইয়া এবং হযরত মুনযর ইব্নে ওমর সকলের উট নিয়ে চরাতে গেলেন এবং হযরত হারাম দু'জন সাথী নিয়ে আমের ইব্নে তোফায়েলের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর পত্রটি পৌঁছাতে গেলেন। আমেরের বাড়ির কাছে গিয়ে হযরত হারিস তাঁর সাথীদ্বয়কে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগে গিয়ে দেখি সে আমার সাথে কি ব্যবহার করে। যদি ভাল ব্যবহার করে তাহলে তোমরাও পরে এস। অন্যথায় এখান থেকেই ফিরে যেও। কারণ তিন জনের মরার চেয়ে একজনের মরাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। আমের ইব্নে মালেকের ভাতিজা ছিল আমের ইব্নে তোফায়েল। সে ছিল মুসলমান বিদ্বেষী। পত্রটি হযরত হারিস তার হাতে দিলে সে তাঁকে বর্শা দ্বারা এমনভাবে বিদ্ধ করল তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

আমের তার গোত্রীয় লোকদেরকে একত্রে করে আদেশ করল, যাও, এখানকার একটি মুসলমানও যেন জীবিত ফেরত না যায় তোমরা তারই ব্যবস্থা কর, কিন্তু সাহাবীগণ আমের ইব্নে মালেকের আশ্রয়ে আছেন বলে তারা দ্বিধাবোধ করতে লাগল। আমেরের বিরাট দলকে মুষ্টিমেয় সাহাবীর সাথে লড়াই করতে হুকুম দিল। বিরাট দলের সাথে অল্প সংখ্যক সাহাবী প্রাণপণ যুদ্ধ করে সকলেই শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁদের মাঝে মাত্র জীবিত ছিলেন হযরত কা'ব ইব্নে যায়েদ। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় মরার মত পড়ে রয়েছিলেন। তাই কাফেররা সকলকে মৃত মনে করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়।

উট চরাতে যে দু'জন সাহাবী গিয়েছিলেন তাঁরা আকাশে দেখলেন শকুন উড়ছে। তারা তখন মনে করলেন নিশ্চয় কোন বিপদাপদ ঘটেছে। খোঁজ নিতে এসে দেখলেন, তাঁদের সাথীরা সকলেই শাহাদাত বরণ করেছেন। আর তাঁদের সাওয়ারীগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ত্রস্ত অবস্থায়। হযরত ওমর ইব্নে উমাইয়া তাঁর সাথীকে বললেন, চল আমরা ফিরে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে এ দুঃখ জনক সংবাদ দেই। খবর তো তিনি পাবেনই হযরত মুনযির বললেন। শাহাদাতের সুযোগ ছেড়ে এ স্থান ত্যাগ করতে আমার এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না। এখানে আমার সাথী বন্ধুরা শুয়ে আছেন। চল এগিয়ে গিয়ে আমরাও তাঁদের



সাথে মিলিত হই। এ কথা বলেই উভয়েই যুদ্ধে লাফিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে হযরত মুনযির শহীদ হলেন এবং হযরত ওমর ইব্নে উমাইয়া হলেন বন্দী। আমেরের মায়ের একটি মানত ছিল গোলাম আযাদ করার। হযরত ইব্নে উমাইয়া সে মানত উপলক্ষে মুক্তি লাভ করেন। ইসলামের গৌরব এ সমস্ত সাহাবীরা। তাঁদের উদ্দেশ্যে ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কাছে শাহাদাত ব্যতীত আর কোন বস্তুই প্রিয়তর ছিলনা। তাঁরা শহীদ হওয়াকে গৌরব মনে করতেন। দুনিয়াতে আল্লাহ্কে খুশি করা ছাড়া আর কোন কাজকেই তাঁরা পছন্দ করতেন না। খাওয়া-পরা সবই যে তারা শুধু আল্লাহ্র খুশির নিমিত্তেই করতেন। নিজের জীবনটি উৎসর্গ করতে তাঁরা সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। বড় দান জীবন দানের চেয়ে আর কি হতে পারে? আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে এটিই তাঁরা দান করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

## হযরত উমায়ের (রাঃ) এর বাণী

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত রাসূল (সাঃ) একটি তাবুতে অবস্থান করে তিনি সাহাবীগণকে বললেন- উঠ, অগ্রসর হও। ঐ জান্নাতের দিকে এগিয়ে চল, যার প্রশস্ততা আসমান-যমীন হতেও অনেক বেশি এবং যা পুণ্যবানের জন্যে তৈরী হয়েছে। হযরত ওমায়ের ইব্নে ইলহাম নামে এক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর কথাগুলো শুনে বলে উঠলেন, চমৎকার। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কথায় এটা বললে? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমারও ইচ্ছা হচ্ছে এ জান্নাতের মধ্যে থাকতে। রাসূল (সাঃ) বললেন, এর মধ্যে তুমিও থাকবে। একথা শুনে হযরত উমায়ের (রাঃ) কটি খেজুর বের করে খেতে খেতে বললেন, এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আবার বললেন, এগুলো কখন শেষ হবে? এতক্ষণ কে অপেক্ষা করবে? একথা বলেই তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে তরবারী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে তাঁর আকাংখিত জান্নাতে প্রবেশ করলেন। -(তাবকাত)

প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই জান্নাতের মূল্য অনুধাবন করতেন। যদি আমাদেরও ঈমান সঠিক হয়ে যায় তাহলে সকল কাজই আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।

## হযরত ওমর (রাঃ)-এর হিযরত

ইসলামের প্রারম্ভে মুসলমানরা যখন দুর্বল এবং সংখ্যালঘু তখন রাসূল (সাঃ) ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির মানসে হযরত ওমরকে মুসলমান করে দেয়ার

জন্যে আবদুল্লাহ্ কাছে আবেদন করলে সে দোয়া কবুল হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) বললেন, যে পর্যন্ত না ওরা মুসলমান হয়েছিল সে পর্যন্ত আমরা কাবার ধারে কাছেও নামায পড়তে পারিনি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, প্রথম দিকে সকলেই লুকিয়ে হিযরত করেছিলেন। কিন্তু ওমর হিযরত করার যখন ইচ্ছা করলেন তখন তিনি তীর-তরবারী নিয়ে প্রথমে কাবা শরীফে গেলেন। তার পর খুব ধীর স্থির হয়ে তওয়াফ শেষে নামায পড়ে কাফেরদের আস্তানায় গিয়ে বলেন, যারা নিজের মাতাকে পুত্রহারা, স্ত্রীকে বিধবা এবং সন্তানকে এতিম করতে চায় তারা যেন মক্কার বাইরে গিয়ে আমাকে বাধা দেয়। কাফেরদের বিভিন্ন আস্তানায় একথা জানিয়ে নির্ভিকচিত্তে মদীনার দিকে বলে গেলেন, তখন তাঁকে বাধা প্রদান করতে সাহস করেনি কোন কাফের।

## মুতার জিহাদ

রাসূল (সাঃ) বুসরাধিপতি কিংবা রোম সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছিলেন। আরব ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকাসমূহে যে সমস্ত আরব নেতা বা গোত্রপ্রধান প্রশাসক নিযুক্ত ছিল তাদের একজনের নাম ছিল শুরাহ্বীল ইবনে আমর। সে রোম সম্রাটের অধীনে বল্কা এলাকার প্রশাসক ছিল। হারেস ইবনে ওমাইর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। শুরাহ্বীল রাসূল (সাঃ)-এর পত্রবাহককে হত্যা করল। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হযরত (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে এক বাহিনীকে সিরিয়া অভিমুখে পাঠালেন। রাসূল (সাঃ)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদ-ইবনে হারেসাকে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "যদি যায়েদ-ইবনে হারেসা শাহাদাতবরণ করে, তবে যাফর তাইয়্যার সেনাপতি হবে। যদি সে-ও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতিত্ব করবে।"

যায়েদ (রাঃ) আযাদকৃত হলেও যেহেতু পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, হযরত যাফর তাইয়্যার (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই এবং হযরতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন বিশিষ্ট আনসার ও প্রখ্যাত কবি। অতএব, জনগণ বিস্মিত হলেন যে হযরত যাফর তাইয়্যার (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকতে কোন্ ভিত্তিতে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি মনোনীত করা হল। বিষয়টি নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু ইসলাম জগতে যে সাধারণ সমতা নিয়ে এসেছে, তা কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ত্যাগ ও



কোরবানীর প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে উসামার অভিযানে যোগদানের জন্য রাসূল (সাঃ) সমস্ত মুহাজিরদের প্রতি নির্দেশ দান করেন। সে অভিযানেও এ যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামাকে সেনাপতিত্ব দান করা হয়। তখনও জনগণের মধ্যে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলে। তখন রাসূল (সাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন; তোমরা তার পিতাকে সেনাপতি করার সময়ও আপত্তি তুলেছিলে; অথচ নিঃসন্দেহে সে সেনাপতি পদের যোগ্য ছিল।" জগদ্বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বোখারীর 'মাগাজী; অধ্যায়ে 'বা'ছে-উসামা' শিরোনামে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। দৃশ্যত যদিও এ অভিযান প্রতিশোধমূলক ছিল, কিন্তু যেহেতু ইসলামের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল লক্ষ্যই ছিল ইসলাম; সুতরাং রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে সর্বপ্রথম সিরিয়াবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। রাসূল (সাঃ) এ নির্দেশও দিলেন যে যেখানে হারেস ইবনে ওমাইর স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে জীবন দান করেছেন, সমবেদনা প্রকাশের নিমিত্ত সেখানে যাবে। খোদ রাসূল (সাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে সাথে 'সানিয়াতুল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর দরবারে নিরাপত্তা ও বিজয়ের কাতর প্রর্থনা জানালেন।

মদীনা থেকে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হল। গুপ্তচর মারফত শুরাহবীল এ খবরপ্রাপ্ত হল। শুরাহবীল মোকাবিলার জন্য পূর্ব থেকেই প্রায় এক লক্ষ্য সৈন্য প্রস্তুত রেখেছিল। এদিকে রোম সম্রাট হিরাকল স্বয়ং আরব গোত্রসমূহের অসংখ্য সৈন্যসহ মা'আব নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এটি বলকার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। হযরত যায়েদ বিষয়টি জানতে পেরে মনে করলেন, বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে খবর পাঠিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, "আমাদের আসল উদ্দেশ্য বিজয় লাভ নয় বরং শাহাদত লাভ। আর শাহাদত লাভের সুযোগ সর্বাবস্থায়ই মিলতে পারে।" অবশেষে ক্ষুদ্র এ বাহিনীই এগিয়ে গেল এবং এক লাখ সৈন্যের উপর আক্রমণ করল। হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্শার আঘাতে শহীদ হলেন। হযরত যাফর (রাঃ) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। প্রথমে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়ার পা দুটি কেটে ফেললেন। অতঃপর তিনি এমন দুঃসাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে অবশেষে তিনি তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধরাশায়ী হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমি যা'ফরের লাশ দেখেছিলাম। তাঁর দেহে তরবারি এবং বর্শার ৯০টি আঘাত

ছিল। প্রত্যেকটিই তাঁর শরীরের সম্মুখভাগে ছিল। তাঁর পিঠে একটি জখমের দাগও বহন করেনি। হযরত যাফরের পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনিও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হল। এবার হযরত খালেদ (রাঃ) যুদ্ধের পতাকা হাতে বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন। সহীহ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সেদিন হযরত খালেদের হাতে আটখান তরবারি ভেঙে খানখান হয়ে পড়ে। কিন্তু এক লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের কি যুদ্ধ হবে? খালেদ (রাঃ)-এর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এ যে তিনি শত্রুর কবল থেকে সেনাদলকে বাঁচিয়ে আনলেন। বাহ্যত এ পরাজিত সেনাবাহিনী মদীনার কাছে পৌঁছলে নগরবাসিগণ তাদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁরা তাদের সমবেদনা জানাবার পরিবর্তে তাঁদের চেহারায় ধূলি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "রে-হতভাগ্য পশ্চাদপরসরণকারীর দল! তোরা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে ফিরে এসেছিস।" এ ঘটনায় রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হল। হযরত যাফরকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর শাহাদতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। রাসূল (সাঃ) মসজিদে গিয়ে শোকার্ত হৃদয়ে বসে রইলেন।

এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন যে যাফরের বাড়ির মহিলারা শোকে মুহ্যমান হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছে। হযরত তাদের আহ'জারী ও ক্রন্দন করতে নিষেধ করে পাঠালেন। লোকটি চলে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমি নিষেধ করলাম, কিন্তু তারা বিরত হয়নি।" হযরত তাঁকে পুনরায় পাঠালেন। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমাদের কথা কোন কাজেই আসেনি।" একথা শুনে রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে "যাও তুমি তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।" এ ঘটনা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে। সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ) সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "আল্লার কসম! তুমি এরূপ করবে না (অর্থাৎ তাদের মুখে মাটি পুরে দেবে না) কারণ এর দ্বারা রাসূল (সাঃ) মনে কষ্ট শুধু বৃদ্ধি পাবে।"

## মৃত্যুর মুখোমুখি সত্যের সোচ্চার কণ্ঠ

হযরত সাঈদ ইব্নে যুবায়ের (রাঃ) ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ৩৭ হিজরীতে কুফায় তাঁর জন্ম এবং ইন্তিকাল ৯৪ হিজরীতে। সাহাবদের একটি নির্বাচিত দলের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী ইব্নে আবু তালেব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ



সাহাবীগণ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ফকীহ। ইলমের বিভিন্ন শাখার বড় বড় ইমামরা তাঁর কাছে আসতেন ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল বলতেন ঃ হাজ্জাজ সাঈদ ইব্নে যুবায়েরকে হত্যা করেছে, অথচ সারা পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তি নেই যে তাঁর ইলমের মুক্ষাপেক্ষী নয়। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না, এটিই ছিল তাঁর দোষ। এ জন্য রক্তপিপাসু গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর রক্তের পিয়াসী হয়ে পড়েন। কুফার গভর্নর প্রসাদে বসে আছেন বনী উমাইয়ার রক্ত পিপাসু গভর্নর হাজ্জাজ ইব্নে ইউসুফ। হাজ্জাজ ছিলেন শাহী তখতের চিরায়ত গোলাম। শাসক যা করবেন সবই ঠিক এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না। শাসকের জুলুম, জুলুম নয়, বরং প্রজার প্রাপ্য, এর বিরুদ্ধে বলা দন্ডনীয় অপরাধ। এ ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ।

রাসূল (সাঃ) বলেন–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অর্থাৎ–অত্যাচারী শাসককে উচিত কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।

হাজ্জাজ দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি কারোর আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় এক কয়েদীর উদয় হল। হাতে-পায়ে শিকল জড়ানো, গায়ের রং কাল। মাথা ও দাঁড়ির চুল সাদা। হাজ্জাজের দু' চোখ থেকে আগুন জ্বলছে। ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

"সাঈদ ইবনে যুবায়ের।"

"না, সাঈদ নয়, শাকী, (অর্থাৎ সৌভাগ্যবান নয়, দুর্ভাগ্য।)

"আমার মা আমার নামের ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভাল জানতেন।"

'তোমার মা ছিল দুর্ভাগ্য আর তুমিও দুর্ভাগ্য।

"গায়েবের খবর রাখের অন্য কোন সত্তা, তুমি নও।

"আমি তোমাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেব।"

" আমি যদি একথা বিশ্বাস করতাম, তাহলে তোমাকে আল্লাহ্ বলে মেনে নিতাম।"

"মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কি বল?"

"নবী রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি ছিলেন আদমের সন্তানদের নেতা। মুস্তফা, নির্বাচিত মনোনীত নবী। মানব জাতির সবাসিত পুষ্প।"

"আবু বকর সম্পর্কে কি বল।"

"তিনি সিদ্দীক ছিলেন। তিনি সততার মধ্যে জীবন-যাপন করেন এবং যখন মারা যান নিজের পিছেনে রেখে যান সুনাম ও সুখ্যতি । জীবনভর চলতে থাকেন তাঁর রাসূলের পথে এবং তাঁর পথ থেকে এক চুলও সরে আসেননি।"

"উমরের ব্যাপারে কি চিন্তা কর?"

"উমর ছিলেন ফারুক। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী । আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দা এবং তাঁর রাসূলের প্রিয় সাথী। নিজের দু'জন বন্ধুর পথেই তিনি চলেছেন এবং তা থেকে একটু বিচ্যুত হওয়া পছন্দ করেননি।"

"উসমান সম্পর্কে কি বল?"

"মজলূম ও শাহাদতপ্রাপ্ত। প্রাচুর্যের মধ্যেও কৃচ্ছ্র সাধনকারী । রুমার কুয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াফ করেছিলেন, জান্নাতে নিজের গৃহ ক্রয়কারী আল্লাহ্ রাসূলের জামাতা ও বন্ধু।"

"আলীকে কেমন মনে কর?"

"আল্লাহ্‌র ও রাসূলের চাচাত ভাই। কিশোরদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। ফাতেমাতুয যোহরার স্বামী এবং হাসান ও হোসাইনের সম্মানিত পিতা।"

"আবদুল মালেকের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?"

"এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ যার বহু গুনাহের মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে তোমার অস্তিত্ব?"

"আমার ব্যাপারে তুমি নিজেই ভাল জান।"

"তবুও আমি তোমরা মুখ থেকে জানতে চাই?"

"তুমি অসন্তুষ্ট হবে এবং রেগে যাবে।"

"তবুও বল।"

"এ ব্যাপারে আমাকে মাফ কর।"



"যদি আমি তোমাকে মাফ করি, তাহলেও আল্লাহ্ আমাকে মাফ করবেন না।"

"আমি তো এতটুকু জানি যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের নাফরমানী করা তোমার জীবনের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। নিজের প্রবৃত্তির ইংগিতে তুমি এমন সব কাজ কর যার মাধ্যমে তোমার ভীতি মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত বসে যায়। কিন্তু এ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।"

"হে সাঈদ! তোমার জন্য আফ্‌সোস ।"

"আফ্‌সোস তার জন্য যাকে জান্নাত থেকে বাঞ্চিত করে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হয়েছে।'

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, সাঈদের সামনে মণি-মুক্তা-ইয়াকুতের স্তুপ সাজাও।"

"যদি তুমি এ উদ্দেশ্যে মণি-মুক্তার স্তুপ করে থাক যে,এর বিনিময়ে তুমি কিয়ামতের দিনের ভীতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবে তাহলে সন্তানের কথা ভুলে যাবে। দুনিয়ার স্বার্থ কামাবার উদ্দেশ্যে যাকে জমা করা হয়েছে তার মধ্যে নেকী নেই, তবে যদি তা হালাল ও পবিত্র হয়।"

"তুমি হাসনা কেন?'

"সে ব্যক্তি কেমন করে হাসতে পারে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে এবং মাটিকে আগুন পোড়ায়?"

এরপর হাজ্জাজ বলতে শুরু করেন ঃ

"আমি তোমাকে এমনভাবে হত্যা করব যেভাবে আজ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করিনি এবং আগামীতেও করব না।"

"তুমি আমার দুনিয়া বরবাদ করবে, আমি তোমার আখিরাত বরবাদ করে দেব।"

"হে সাঈদ! নিজের জন্য যে ধরনের মৃত্যু পছন্দ করতে চাও কর।"

হাজ্জাজ! আখিরাতে নিজের জন্য যে ধরনের হত্যা পছন্দ হয় তাই এখানে অবলম্বন কর।"

"তমি কি চাও আমি তোমাকে মাফ করে দেই?"

"যদি মাফ করে দাও তাহলে মাফ হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, এতে

তোমার কোন অবদান থাকবে না। তুমি এ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হবে না। এবং তোমার কোন ওজর কবুলও করা হবে না।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, নিয়ে যাও এবং হত্যা কর।"

সাঈদ দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে হেসে ফেললেন। হাজ্জাজের কাছে খবর পৌঁছে গেল। তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হাসলে কেন?

"আল্লাহ্র মোকাবিলায় তোমার দুঃসাহজ এবং তোমার মোকবিলায় আল্লাহ্র হুকুম দেখে আমি অবাক হয়েছি।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, "যে চামড়ার পর হত্যা করা হবে সেটি বিছিয়ে দাও।" চামড়া বিছান হল। হুকুম হল, এবার হত্যা কর।"

সাঈদ কিবলার দিকে মুখ করে পড়লেনঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাঁউ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, "আমি একান্তভাবে নিজের মুখ সে সত্ত্বার দিকে ফিরালাম যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভূক্ত নই।"

হাজ্জাজ চিৎকার করে ওঠলেন, "ওর মুখ কিব্লার দিক থেকে ফিরিয়ে দাও।"

"সাঈদ বললেন, আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্" যে দিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই আছেন আল্লাহ্র সত্ত্বা।"

হাজ্জাজ ক্রোধে চিৎকার দলিন, "তাকে জমিনের ওপর উপুড় করে দাও।"

সাঈদ বললেন, "মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নূয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।" এ জমিন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এর মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব, সকলকে এর ভিতর থেকে তোমাদর পুনরায় বের করে আনব।

হাজ্জাজ হুংকার দিলেনঃ ওকে শিগগির জবাই কর।

সাঈদ কালেমা শাহাদত পড়ে বললেন, "হাজ্জাজ এবার বলল রোজ কিয়ামতে তোমর সাথে দেখা হবে। 'হে আল্লাহ্ আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষমতা যেন তার না থাকে।" এরপর জল্লাদের তরবারী তাঁকে দ্বি-খন্ডিত করল।

# নবম অধ্যায়

## সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞানচর্চা

### কুরআনের খিদমত

মুরতাদদের শায়েস্তা করা, বিদ্রোহীদের দমন করা এবং মিথ্যা নবীদের চিরতরে নিচিহ্ন করে দেয়া যেমন ফরয ছিল, ঠিক তেমনই কুরআন পাকের খিদমত করা এবং চিরকালের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত আকারে নকল করে রাখাও ফরয ছিল। অন্যথায় পরবর্তীকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। অপরাপর কাজের ন্যায় এটাও কোন রকমে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলনা। কারণ বহু হাফেয রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই ইন্তিকাল করেন। তারপর বার শত হাফেয শুধু ইয়ামামার যুদ্ধেই শাহাদতবরণ করেন। তখন পর্যন্ত অনেকের কাছে আংশিকভাবে কুরআন লিখিত ছিল। আবার কেহ কেহ পূর্ণ হাফেয ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এ প্রয়োজনের দিকে কোন সময় ইঙ্গিত করেননি। কিন্তু সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে কুরআন পাকের হিফাযত করা হোক।

কুরআনের হিফাযত স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে নিয়াছেন বলে ওয়াদা করেছেন। তাই প্রথমে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-বলেছেন-"যে কাজ স্বয়ং রাসূল (সাঃ) করেননি, এটা আমি কিভাবে করতে পারি।" কিন্তু পরিস্থিতি গুরুতর দেখে তিনিও এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর সীনা খুলে দিলেন এবং তিনি পূর্ণ প্রেরণা নিয়ে এ কাজে মনোযোগী হন।

অতঃপর তিনি কাতিবে ওহী হযরত যায়েদ ইব্নে সাবিত আনসারী (রাঃ)-কে এ গুরু দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। প্রথমে হযরত যায়েদ (রাঃ)-ওযর পেশ করেন, "যে কাজ স্বয়ং রাসূল (সাঃ) করেননি, আমি কিভাবে এটা পারব।" কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার পর তিনিও এতে সম্মত হন এবং পূর্ণ উদ্যম নিয়ে এ কাজে মনোযোগী হন। অতঃপর বিভিন্ন স্থান হতে লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহ করে কিতাবের আকার দান করতে আরম্ভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রাঃ) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন-"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর আদেশে হযরত যায়েদ ইব্নে

সাবিত (রাঃ) বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে কুরআনের বিভিন্ন অংশ একত্রিত করে কিতাবের রূপ দান করেন। হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের কালে এর বহু কপি নকল করে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।"

বর্তমানে আমাদের কাছে কুরআন মজীদের যে সমস্ত কপি আছে, এটা হযরত উমর (রাঃ)-এর পরামর্শ, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর আদেশ এবং হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টারই সুফল। এর তরতীব, সূরাসমূহের নাম ইত্যাদি ওহী যোগে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রাসূল (সাঃ)-কে অবগত করান হয়েছিল।

অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এ কিতাব নকল করা হয়। মসজিদে নববীতে হাফেযগণের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক নামাযের পর কুরআন নকল করার কাজ সম্পন্ন করা হত। কিতাব পূর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এটা রাষ্ট্রীয় ট্রেজারীতে সংরক্ষণ করেন। তাঁর পর এটা হযরত উমর (রাঃ)-এর হিফাযতে আসে। এর পর হযরত উসমান (রাঃ) এর বহু কপি নকল করে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।

## ওহী লিখার কাজে সাহাবায়ে কিরামের অবদান

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এর যাবতীয় কিছু সত্য ও ইতিহাস নির্ভর। বনোয়াট বা কল্পনা প্রসূত কোন কিছু সৃষ্ট বা তাঁর কথিত বাণী নয় তার সত্যতা ও বাস্তবতা নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ বাণী সংরক্ষনের জন্যে রাসূল (সাঃ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ওহী নাযিল হলে তিনি সেটাকে নিজে কেবল মুখস্ত রাখতেন না বা অন্যকেও মুখস্ত করাতেন না, কাতিব বা লেখকদের দ্বারা সেটা লিখিয়ে রাখতেন, যাতে সেটার সামান্যতম ভুল বা বিকৃতি না ঘটে। রাসূল (সাঃ) তাঁর সুযোগ্যতম সাহাবীদের দিতে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করতেন। একথা সর্বজন বিদিত যে রাসূল (সাঃ) নিজে লিখা-পড়া জানতেন না। যাঁরা এ মহান কাজটি লিখার কাজে নিয়োজিত থাকতেন তাঁদের বলা হয় কাতিব। কাতিব শব্দের অর্থ লেখক বহু বচন কাতিবীন অর্থাৎ লেখকবৃন্দ। ওহী এককভাবে কারো দ্বারা লিখিত হয়নি। এ মহতী কাজটিতে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। তাই ওহী লিখার কাজে নিয়োজিত পূণ্যাত্মাগণকে কাতিবীনে ওহী বলা হয়। আর ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলঃ আল্লাহ্‌র ঐ কালামকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে কোন নবীর উপর। বিভিন্ন সূত্রে অনেক গবেষণার পর ওহী লিখকদের সংখ্যায় ৪০



জনের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা তেমন প্রসিদ্ধ নয়। সর্বশেষ গবেষণায় ওহী লিখকদের মধ্যে ২১ জনের নাম পাওয়া যায়। কোন সনে কোন তারিখে ওহী লিখার কাজ শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না বা ইতিহাসে তেমন কোন বিবরণ উল্লেখ নাই। সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ কে লিখেন তা অবগত হওয়া যায়। হযরত খালিদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) যিনি ইসলাম গ্রহণের দিকে পঞ্চম তাঁর কণ্যা বলেন, আমার পিতাই সর্বপ্রথম বিস্‌মিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম লিখেন। এটা হিজরী চতুর্থ সনের রবীউল আউয়াল মাসের কথা। এ হিসাবে দেখা যায় হযরত খালিদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) সে পুন্যাত্মা যিনি সর্বপ্রথম ওহী লিখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বশেষ ওহী যা রাসূল (সাঃ)- এর ওফাতের আট কিংবা নয় দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল তার লিখক ছিলেন হযরত উবাই ইব্‌নে ক্বাব (রাঃ)। তিনি সর্বাধিক ওহী লেখকদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) এবং পরবর্তীতে হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রাঃ)- এর পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাঃ)। কাতিব চার প্রকার যথাঃ কাতিবে তকদীর, কাতিবে নেক ও বদ; কাতিবে ওহী এবং কতিবে কোরআন ও হাদীস। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের কাতিব সম্পর্কে আশা করি বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। কারণ কাতিবে তাকদীর হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক, কাতিবে নেক ও বদ তথা আমল নামার লেখক হলেন আল্লাহ্‌র নিযুক্ত ফেরেশতা এবং কাতিবে ওহী হলেন সে সমস্ত নিষ্পাপ সাহাবা যাঁদের কে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) আসমানী বাণী লেখার অনুমতি দান করেছেন কিংবা নিযুক্ত করেছেন।

সুতরাং এ তিন প্রকারের কতিবের মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে যে কতটুকু তা বলে শেষ করা যায় না। অবশ্য শেষাক্তে কাতিবে কোরআন ও হাদীসের সর্বদা সম্বন্ধে চিন্তা করুন। তাঁরা সুন্দর আরবী হস্তাক্ষরের মাধ্যমে কোরআন পাক নকল করেছেন।

ওহী লিখার কাজে যে সমস্ত পূন্যাত্মাগণ খিদমতে আনজাম দিয়েছেন তাঁরা হলেন- (১) হযরত খলিদ ইব্‌নে সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) (২) হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) (৩) হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) (৪) হযরত উসমান ইব্‌নে আফফান (রাঃ) (৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে রওয়াহা (রাঃ) (৬) হযরত সাবিত ইব্‌নে কাইস (রাঃ) (৭) হযরত আলী ইব্‌নে আবু তালিব (রাঃ) (৮) হযরত মোহাম্বিনে মুসলিমা (রাঃ) (৯) হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামন (রাঃ) (১০)· হযরত মুগিরা ইব্‌নে ওরা (রাঃ), (১১) হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম

(রাঃ), (১২) হযরত শুরাহবীল ইব্‌নে হাসান (রাঃ), (১৩) হযরত আবান ইব্‌নে সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ), (১৪) হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), (১৫) হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ), (১৬) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), (১৭) হযরত হানযালা ইব্‌নে রবীয়া (রাঃ), (১৮) হযরত আমের ইব্‌নে কুহাইরা (রাঃ), (১৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আকরাম (রাঃ), (২০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই (রাঃ), (২১) হযরত উবাই ইব্‌নে কাব (রাঃ)।

## ভন্ডনবী মুসালামা হত্যা এবং কোরআন সংকলন

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সুযোগ সন্ধানী ইসলামের শত্রুদল মাথাচড়া দেয়ার সুযোগ পেল। যারা স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে বিবিধ উপায়ে ইসলামের বিরোধিতা করত তাদের ধারনা ছিল যে, ইসলামের এ শৃঙ্খলা রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমিত। তাঁর অবর্তমানে মুসলমানদের এ ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারা অল্প দিনের মধ্যে অবগত হল যে রাসূল (সাঃ) যে মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ধর্ম। এর ভিত্তি স্থাপনে রাসূল (সাঃ) স্বীয় সাহাবীদের মধ্যে যে প্রেরণা দান করেছেন, তা ধ্বংস করার মত নয়। সুতরাং রাসূল (সাঃ)-এর পরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ঠিক সে রকমই সু-দৃঢ় থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে রাসূল (সাঃ)-এর পর সুযোগ সন্ধানী ইসলামের শত্রুরা চারদিক থেকে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) -এদের অস্তিত্ব নির্মূল করে চিরতরে তাদের ধ্বংস করেন। মুসায়লামা কায্‌যাবই প্রথম মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার, যে রাসূল (সাঃ)-এর জীবিতকালেই হিজরী দশম সনে নবুয়তের দাবী জানায়। একবার বনু হানিফার এক প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে এ দলে মুসাইলামা বিন তামামাও ছিল। সে ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলে-আমি এ শর্তে মুসলমান হতে পারি মুহাম্মদ নিজের পরে আমাকে খলিফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর হাতে খেজুরের একটি ডাল দেখিয়ে তাকে বলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে এ ডালটিও চাও, আমি তাও তোমাকে দেবনা। এর পর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি সে মিথ্যাবাদী, যার সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে। একবার রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে হাতে দু'টি কংকন দেখে ভীষণ চিন্তিত হলেন। তাঁকে ফুঁক দিতে বলা হলে তিনি তাই করলেন, সাথে সাথে কংকন



দু'টি উঠে যায়। পরে তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে ব্যক্ত করলেন যে, আরবে দু'জন মিথ্যাবাদী নবীর আবির্ভাব হবে। তাদের একজন আসওয়াদ আনাসী এবং মুসাইলামা কায্‌যাব। (মুসলিম)

এর পর মুসাইলামা কায়যাব নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে যায় এবং পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ)-এর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে নবুয়তের দাবী করে সে বলে নবুয়তীতে আমাকে মোহাম্মদের অংশীদার করে দেয়া হয়েছে। এ মর্মে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি চিঠি লেখে-আল্লাহ্‌র রাসূল মুসাইলামার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবুয়তী আমাকে আপনার শরীক করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর অর্ধেক আপনার এবং অর্ধেক আমার। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি ইনসাফ করবেন বলে আমি আশাবাদী না। রাসূল (সাঃ) তার পত্রের জবাবে রাসূল (সাঃ) লিখেন-'যে হিদায়েত অনুসরণ করে, তাকে সালাম। এ পৃথিবী মূলতঃ আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। আর মুত্তাক্বীদের পরিণাম অত্যন্ত সাফল্যজনক হয়ে থাকে।'

মুসায়লামা ব্যতিত তালিহা ইব্‌নে খুয়ায্‌লদও নবুয়তের দাবী করেছিল। গিফতার গোত্রের লোক তার অনুসারী ছিল এবং ওয়াইনা ইব্‌নে হাসান ফেরারী ছিল তার মন্ত্রণাদাতা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আসওয়াদ আনাসী ইয়ামানীও নবুয়তের দাবী করেছিল। সাজ্জাহ বিনতে হারিসা নামে জনৈক মহিলাও নবুয়তের দাবী করে এবং আশআস ইব্‌নে কাইসকে তার মুখপাত্র নিযুক্ত করে। তারপর সে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসায়লামাকে স্বামীরূপে বরণ করে। অথচ আশআদও সাজ্জাহকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করত। মুসালামার সাথে বিবাহ হলে সে হতভম্ভ হয়ে পড়ে। এভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে এ রোগ বিস্তার লাভ করে বহুলোককে পথভ্রষ্ট করে।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইকরিমা ইব্‌নে আবী জাহেলকে মুসালামার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে তাঁর পিছনে শুরাহবিল ইব্‌নে হাসানাকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন আর ইকরিমাকে বলেন যেন শুরাহবিলের জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ইকরিমা বিজয়ের মুকুট এককভাবে গ্রহণের জন্য শুরাহবিলের জন্য অপেক্ষা না করেই মুসাইলামাকে আক্রমণ করলে পরাজয় বরণ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এ সংবাদে খুবই মর্মাহত এবং অসন্তুষ্ট হন। পরবর্তীতে তিনি মুসাইলামার বিরুদ্ধে হযরত

খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং শুরাহবিলকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর আগমণ সংবাদ অবগত হয়ে মুসাইলামা চল্লিশ হাজার সু-বিশাল বাহিনীসহ অগ্রসর হয়। খালিদ (রাঃ) এদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে বহু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে মুসাইলামাকে মোকাবেলার জন্য আহবান করলে তার পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হলে সে পলায়ন করে একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে" তার বাহিনীও পালাতে থাকে। মুসাইলামা বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর বাগানের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। মুসাইলামা এ বাগানটির নাম রেখেছিল হাদীকাতুর রহমান। এখানে সে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজকে একটু নিরাপদ মনে করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম সৈন্যদের রণকৌশল দেখে সে ভরসাও তার শেষ হল। দুর্ধর্ষ মুসলিম যোদ্ধা হযরত রাবা ইব্‌নে মালিক আনসারী (রাঃ) বললেন আমাকে তোমরা বাগানে নিক্ষেপ করে দাও, তাঁরা তাঁকে বাগানে নিক্ষেপ করলে তিনি একাই বাগানে প্রবেশ করে প্রহরীদের হত্যা করে বাগানের প্রবেশদার খুলে দিলে দলে দলে মুসলিম সৈন্যদল বাগানে প্রবেশ করে মুসাইলামার সহচরদের হত্যা করতে লাগলেন। অবশেষে মুসাইলামাও আল্লাহ্‌র তরবারী হতে রক্ষা পেলনা। মুসালামাকে যাঁরা হত্যা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শীও ছিলেন। এ ওয়াশী মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি যে বল্লম দ্বারা হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিলেন ঐ বল্লম দ্বারাই একই পদ্ধতিতে নাভীমূলে আঘাত করে মুসাইলামাকে হত্যা করেন। মুসায়লামার সাথে রণক্ষেত্রে তার স্ত্রী সাজ্জাও উপস্থিত ছিল। স্বামী নিহত হবার সংবাদ পেয়ে বসরার দিকে সে পলায়ন করে এবং কিছু দিন পর সে মারা যায়। এ যুদ্ধে মুসায়লামার সতের হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলমানদের নিহত হন এক হাজার দুই শত সৈন্য। এদের সকলেই প্রায় কুরআনে হাফেয ছিলেন।

দ্বিতীয় মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ছিল তালীহা ইব্‌নে খুয়ায়লদ আ'সাদী। সে ছিল অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী। হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালীদ তার মোকাবেলা করেন সু-দীর্ঘ সময়। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে সে শাম দেশের দিকে পলায়ন করে। তার বহু সৈন্য নিহত হল এবং পলায়ন করলে নিরুপায় দেখে শেষে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার লকীত ইব্‌নে মালিক। আম্মান এলাকায় সে এ বলে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। তার আহবানে বহু মুরতাদ এবং ইসলামের





শত্রতার অনুসারী হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাকে সমোচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। লকীতের সৈন্যবাহিনী যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি ছিল অভিজ্ঞ সু-নিপুণ যোদ্ধা। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মুসলিম সৈন্যদের মোকাবেলায় শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করে পালাতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যরা শত্রু এলাকায় ভিতরে প্রবেশ করে লকীতের অনুসারীদের চিরতরে শেষ করেন। আসওয়াদ আনসারীও ছিল নবুয়তের আরেক দাবীদার। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে সেও মুসায়লামার ন্যায় দাবী জানিয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সে বিশেষভাবে তার নবুয়তের প্রচার আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু সেনাবাহিনী তার মোকাবেলা করার পূর্বেই কাইস এবং ফিরোযা নামক দু'ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। তার অনুসারীরা তার লাশ কাঁধে তুলে তাকে 'শহীদে মাযহাব' উপাধীতে ভূষিত করে তার মাযহাবের প্রচারনা চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলিম সৈন্যদল বীরত্বের সাথে এদের প্রতিহত করে নিচিহ্ন করেন।

## হাদীসের খিদমত

**আরবদের স্মরনশক্তি ঃ** হাদীসের হিফাজতের ক্ষেত্রে মুখস্তকরনটা ছিল সে যুগের এক নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, কারণ আরবীয় লোকদের স্মরনশক্তি ছিল অস্বাভাবিকভাবে প্রখর। তাঁরা শত শত কবিতা মুখস্ত রাখতেন কেবল নিজেদের বংশ তালিকা নয়, পালিত গোড়ায় বংশ ধারাও তাদের মুখে মুখে থাকত। এটা জাগতিক নিয়ম যে, যে শক্তির যত বেশী ব্যবহার চলে, তত বেশী তার উন্নতি সাধিত হয়। সাহাবীও তাবেয়ীগণের জমাত তাঁদের মেধা স্মরণশক্তিকে নানান উপায়ে সতেজ ও শানিত করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছেন। সে যুগের হাফিযে কোরআন হাদীস হিফয করে একেকজন মুহাদ্দিস হাজার হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখতেন। তাই সে যুগে হাদীসের হাফিয হওয়া ছিল অনেকটা সাধারণ ব্যাপার। উম্মতে মোহাম্মদদীর মধ্যে পূর্ব যুগে শতাধিক হাফিজুল হাদীস ছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

**হযরত ওয়াহশী (রা:)-এর স্মরনশক্তি ঃ** ইমাম বুখারী (রা:) বর্ণণা করেন যে হযরত যাফর আমর জামরী বলেছেনঃ আমি উবাইদুল্লাহ ইব্‌নে সাদী ইবনুল খিয়ার (রা:)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। হযরত উবাইদুল্লাহ্ ও খাহশী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন আমি

আপনাকে তো চিনি না, তবে স্মরণ পড়েছে। প্রায় বছর খানেক পূর্বে আমি একদিন আদী ইবনুল খিয়াস নামক জনৈকের কাছে যাই। সে দিন আদীর ঘরে একটি ছেলে ভূমিষ্ট হয়। ছেলেটাকে চাঁদের দ্বারা আবৃত করে ধাত্রীর কাছে নিয়ে গেল। বাচ্চাটির সমস্ত শরীর ঢাঁকা ছিল। আমি শুধু তার পা দুটি দেখেছিলাম সেই বাচ্চার পায়ের সাথে তোমার পায়ের বেশ মিল রয়েছে। (বস্তুতঃ হযরত উবাইদুল্লাহ্ই সেই বাচ্চা) বুখারী ঃ (২/৫/৮৩)

ইতিপূর্বে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর স্মরণ শক্তির ঘটনা ও আলোচ্য ঘটনা দুটিকে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সাহাবায়ে কিরামের স্মরণশক্তির প্রখরতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের পাতায় এরূপ অজস্র ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

## রাসূল (সাঃ)-এর যুগে হাদীস লিখা

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে যদিও নিয়মিতভাবে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ছিলনা, তার পরেও সবকিছু লিপিবদ্ধাকারে সম্পন্ন হত। আবার এসব লিখাকে সংরক্ষণ করা হত। এ কাজের জন্যে সাধারণ 'কাতিব' ছাড়াও কতিপয় বিশিষ্ট লিখক নির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁদের উপর অর্পিত খিদমত যথাসাধ্য অতি সুন্দরভাবে দায়িত্ববোধের সাথে আদায় করে যেতেন। ঐতিহাসিক 'জাহশিয়ারী' তাঁর 'কিতাবুল ওয়াজারাই ওয়াল-কুত্তাব' গ্রন্থে (আসমাউ মান সাবাতা আলা কিতাবাতি রসূলিল্লাহি (সাঃ)) শিরোনামে এ সকল সাহাবীদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন-"হযরত আলী ও হযরত উসমান (রাঃ) এরা দু'জনই ওহী লিখতেন। কোন সময় তাঁরা অনুপস্থিত থাকলে হযরত উবাই ইবনে কা'আব ও হযরত যায়েদ ইব্নে সাবিত (রাঃ) এ কাজটি আঞ্জাম দিতেন। খালিদ ইব্নে সাঈদ ইবনে আ'স ও মুয়াবিয়া ইব্নে আবি সুফিয়ান (রাঃ) এরা দু'জন রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি লিখে রাখতেন। হযরত মুগীরাহ ইব্নে শো'বা ও হোসাইন ইব্নে নুমাইর (রাঃ) এরা দু'জন জনসাধারণের কার্যাবলী ও পারস্পরিক লেন-দেনের ব্যাপারাদি লিখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আরকম ইব্নে আবদেয়াগূস ও আলী ইব্নে উকবা (রাঃ) আবর গোত্রগুলোর কূপসমূহ এবং আনসারীদের স্বামী-স্ত্রীর বিষয়াদি লিখতেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) যেমন ওহী লিখতেন তেমনি বিভিন্ন রাজা বাদশাহগণের প্রতি চিঠি পত্র এবং দাওয়াতনামা লিখার দায়িত্বও তাঁর উপর ছিল। হযরত মুয়াইকীব ইব্নে আবু ফাতিমা (রাঃ) মালে গণিমতের ব্যাপারসমূহ লিখে রাখতেন। হযরত



হান্জালা ইব্নে রবী (রাঃ) এ সকল কাতিবের অনুপস্থিতিতে তাঁদের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল 'আল-কাতিব'।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল (সাঃ)-এর যুগে প্রত্যেক বিভাগের জন্য দু'জন করে দায়িত্বশীল লিখক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য লিখকগণ দায়িত্ব পালন করে যেতেন। এমনিভাবে রাসূল (সাঃ)-এর যাবতীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ)-এর সকল চুক্তিপত্র, সন্ধিপত্র, দাওয়াতনামা ও অন্যান্য চিঠিপত্র ও লিখাগুলো প্রথমে কাতিবের দ্বারা লিখাতেন। অতঃপর তা নিজে শুনে সত্যায়িত করতেন। সুতরাং ওহীর পর রাসূল (সাঃ)-এর এ সকল চিঠিপত্রের মর্যাদা সবার শীর্ষে। এগুলো গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ হওয়াতে কোন রকমের শোবা-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। রাসূল (সাঃ)-এর কোরআন তিলাওয়াত, কোরআনের মর্মবাণী শিক্ষাদান এবং অবিরাম মৌখিক উপদেশ দান ও সতর্কীকরণের পাশাপাশি আশ-পাশের রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বরাবরে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। এসব পত্র হাদীস, তফসীর, নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব পত্রের সংখ্যা শতাধিক।

## হাদীস লিপিবদ্ধকরণ

হাদীস হিফাযতের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ। বস্তুতঃ হাদীস সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থাই যথা সময় গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসকে যেমন মুখস্থ ও স্মরণ রাখা হয়েছে, নানাভাবে চর্চা করা হয়েছে, নানা তথ্য দ্বারা সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ করে তোলা হয়েছে, অনুরূপভাবে এর জন্য যথা সময় যথেষ্ট পরিমাণে লিখনীশক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার প্রায় একই সময়ে একই সাথে এসব ব্যবস্থা নিয়মানুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে। "আসলে মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ তিন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক শহরে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্রিত করা হয়েছে এবং সেগুলোই বর্তমানে পুস্তকাকারে আমাদের কাছে রয়েছে। প্রথম পর্যায় সম্ভবত ১০০ হিজরী পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় ১৫০ হিজরী পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় ১৫০ হিজরী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর পরেও কিছুকাল বর্তমান ছিল।

## হাদীস রাসূল (সাঃ)-এর লিখিত সম্পদ

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে কোরআনের মত না হলেও রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসগুলো অতি যত্নসহকারে লিখিতকারে সংরক্ষণ করা হত। এখানে তার কিছু বিবরণ দেয়া হল-রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিযরত করে মদীনায় স্থায়ী বসবাস শুরু করার পর সর্বপ্রথম যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, মদীনার ইয়াহুদী ও আশ-পাশের খৃষ্টান এবং মদীনার আনসার ও মুহাজির মুসলমানদের পারস্পরিক আক্রমণ ও অন্যান্য শর্ত সম্বলিত এক দীর্ঘ চুক্তিনামা রচনা করা তার অন্যতম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়েরৎসর (৮ম হিজরী) 'খোজায়া' গোত্রের লোকেরা 'লাইছ' গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ খবর রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছলে তিনি সাওয়ার থাকাবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি হেরম শরীফের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং নরহত্যার দন্ড ও দিয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ভাষণ শেষে আবুশাহ নামক জনৈক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-কে বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ভাষণটি লিখে দেন"। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতঃ জনৈক সাহাবীকে বললেন, এ ভাষণটি আবুশাহকে লিখে দাও।

## সাহাবীদের হাদীস মোতাবেক আমল

হাদীস হিফাযতের ক্ষেত্রে হাদীস অনুযায়ী আমল করা একটি অন্যতম উপায়। তাই উম্মতে মোহাম্মদীর সর্বপ্রথম দল অর্থাৎ সাহাবীদের কে আমরা এ ব্যাপারে অধিক যত্নবান দেখতে পাই। তাঁরা রাসূল (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীসকে কেবল মুখস্ত রেখে ও বৈঠক সমূহে এর মৌখিক প্রচার ও পর্যালোচনা করে ক্ষান্ত হননি। বরং প্রতিটি হাদীসের বাস্তব অনুসরণ ও সে মতে আমল করে হাদীসে রাসূল (সাঃ)কে সাহাবায়ে কিরাম তা মুখস্ত করে মন মগজে দৃঢ়বদ্ধ করে নিয়ে সে মতে স্ব স্ব আক্বীদা বিশ্বাস গড়ে তুলতেন। আর যখন কোন আদেশ সূচক ও নিষেধ মূলক উক্তি করতেন, কোন শাসনতান্ত্রিক ফরমান জারী করতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম সাথে সাথে তাকে বাস্তব রূপে দেখার চেষ্টা করতেন। অনেক সাহাবী বলতেনঃ রাসূল (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি বা এরূপ বলতে শুনেছি। মূলত ঃ যে কাজের উপর আমল হয় তা মানসপটে খুদাই হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামগণের জামাত ফরয, ওয়াযীব তো বটেই, প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গীকে পর্যন্ত নিজ নিজ আমলে রূপায়িত করেছিলেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর জন্য জানমাল কোরবানকারী সাচ্চা আশেক এবং নিষ্ঠাবান প্রেমিক।



হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমাদের কেহ যখন ১০টি আয়াত শিক্ষালাভ করতেন তখন এর অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে তিনি অন্য কিছু শিখার জন্য অগ্রসর হতেন না। (জামিউ বায়ানিল ইলম) ইসলামের মৌলিক আইন কানুনকে সাহাবীদের জীবনে রূপায়িত করে তোলার দিকে রাসূল (সাঃ) নিজে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ মেনে চলে কিনা, সে দিকে তিনি কড়া নযর রাখতেন। অর্থাৎ ইসলামের ব্যবহারিক আচর আচরণ অনুসরণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত।

নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবেই নামায পড়। (বুখারী) হজ্বের ব্যাপারে তিনি বলেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্ব উদ্‌যাপনের নিয়ম কানুন গ্রহণ কর। উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝা যায় হযে, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আন্যান্য কাজের বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য রাসূল (সাঃ) নিজে প্রথম সে কাজ করে লোকদের সামনে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, কাজে তাঁদের কোন ভুল ত্রুটি হলে তিনি সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন। একদিন তিনি মসজিদে নববীতে একজন সাহাবীর নামায পড়া লক্ষ্য করে করলেন। নামায শেষে সে সাহাবী তাঁর কাছে এলে তিনি বসলেনঃ তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তেমার নামায পড়া হয়নি অর্থাৎ নিয়ম, তোমাবেক আদায় হয়নি। এভাবেই সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ) এর সামনে সংস্পর্শে থেকে ইসলামের আদর্শিক রীতি নীতির বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মোট কথা রাসূল (সাঃ) এর যাবতীয় ইবাদত, মোয়ামালাত, কথাবার্তা, লিবাস-পোশাক, খাওয়া-পড়া চলা-ফিরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে সাহাবীগণ তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করেননি। বস্তুতঃ সাহাবীদের এরূপ অনুসরণের মাধ্যমেই রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ এবং কাজের বিবরণ চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত রয়েছে।

ফরায়েয শাস্ত্র. হল অত্যন্ত জটিল বিষয়। পবিত্র কোরআনে যদিও ফরায়েযের সমস্ত মাসআলা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা এবং নির্দেশাবলী ও সাহাবায়ে কিরামের ফতওয়া ইত্যাদি হচ্ছে

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। মীরাস সম্পর্কে কোরআনে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যথা স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-ছেলে, মেয়ের, মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও কালালা ইত্যাদি কয়েক প্রকারের ওয়ারিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এরপরও বলা হয়েছে যে তা হল আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা। অতএব যারা এ সীমা লংঘণ করবে, তারা নিজেদের উপরই জুলুম করবে। রাসূল (সঃা) স্বীয় রায় দান এবং আদেশ নির্দেশের মাধ্যমে এ সংক্ষিপ্তের ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর হয়ত যয়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) ফরায়েয বিদ্যাকে এমনি উন্নতি করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত তা রীতিমত একটি শাস্ত্রে পরিণত হল।

অনেক বড় বড় সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর কাছে ফরায়েয সম্বন্ধীয় মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) এর ইলম ও ফযল সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম স্বীকার করতেন তা সত্ত্বেও তিনি এর এক গোলাম মারা মাওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যেঃ এ মৃত গোলামের পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে এর কন্যাদের অংশ দিলেই ভাল হয়। অবশ্য ইচ্ছা করলে দেয়া যাবে। অতঃপর ওমর (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) এর কথায় এভাবে আমল করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর যে কজন গোলামের মৃত্যু হয়েছে, কারও পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে ওমর (রাঃ)-এর কন্যাদের অংশ দিলেন না। অর্থাৎ গোলামের মৃত্যু হলে মালিক কন্যা সে গোলামের ওয়অরিশ হয় না। ইয়ামামাবাসীদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ইয়ামামা যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল তার কোন সঠিক প্রমাণ না থাকায় তাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর ফতওয়া মুতাবেক হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আমল করেছিলেন। অর্থাৎ যারা জীবিত ছিল তাদেরকে কেবল ওয়ারিশ সাব্যস্ত করেছিলেন। প্রত্যেককে ওয়ারিশ করা হয় নাই। -(কানযুল উম্মাহ)

আমওয়াস নামক স্থানে প্লেগ রোগে অনেক লোকের মৃত্যু হল। কোন কোন পরিবারে কেহই অবশিষ্ট ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) তখন হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ফতওয়া মুতাবেক আমল করেছিলেন। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজের শাগরেদ হযরত ইকরামাকে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার স্ত্রী এবং মা রয়েছে। এখন তাদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি কিভাবে



ভাগ করা যাবে। তিনি উত্তরে বলেন- স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মায়ের অংশ। অতপর অবশিষ্ট সম্পদ পিতা পাবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মাকে দিতে হবেই তিনি পুনরায় ইকরামাকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোরআনে কি সে রকম আছে যা আপনি বলেছেন, না এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। তখন তিনি বললেন এটা আমার ব্যক্তিমত অভিমত কেমনা আমি বাপের উপর মায়ের প্রাধান্য দিতে পারি না অর্থাৎ যেহেতু সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মাকে দিলে বাপের অংশ হ্রাস পাবে। তাই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সম্পদের এক চতুর্থাংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার ফতওয়া দেয়া হল। (কালযুল উম্মাল- ৬)

পবিত্র কুরআনে মিরাস সর্ম্পকে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ছাড়া হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর চিন্তাধারা আরও অনেক রকমের সম্ভাব্য মাসায়েল বের করেছেন। সেই নতুন নতুন দিক সমূহ শেষ পর্যন্ত ফরায়েয শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন গোলামের মীরাস নীতির মীরাস। ভাইয়ের মীরাস, দাদার মীরাস, মীরাস হতে বঞ্চিত ব্যক্তি যায় কারণে অন্য ব্যক্তি বঞ্চিত হয়। প্রভৃতি আরও বহু প্রকারের মাসায়েল তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি দাদার মীরাস সম্বন্ধে সে অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ব্যতিত যাচাই করার পর দেখা যায় যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মতামতই শরীয়তসম্মত।

প্রকৃতপক্ষে ফরায়েয শাস্ত্রে দাদার মীরাস সম্পর্কীয় আলোচনাই সর্বাধিক দীর্ঘ এবং জটিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে তার সর্বশেষ মতামত কোন রকমের মত পরিবর্তন করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর কার্যকারিতাই শরীয়ত সম্মত বলে ধার্য করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দাদা হসিাবে নিজের মৃত নাতির পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়েছিলেন। তাঁর এক নাতির মৃত্যু হলে তিনি নিজেকে সে মৃত নাতির সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বলে মনে করলেন। এতে অপরাপর সাহাবীগণ সম্মতি দিলেন না বরং এর বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্তি করলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) এ ব্যাপারে ফতওয়ার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর ঘরে পৌছলে যায়েদ (রাঃ) বললেন আমি সে নাতির মীরাস সম্পর্কীয় মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। ইতিপূর্বে এ মীরাসের ব্যাপারে যা করেছি সকলেই এর বিরোধিতা করছে। এজন্য আমি

আপনার নিকট এসেছি। এ ব্যাপারে যদি আপনার মতামতাদি আমার স্বপক্ষে হয় তাহলে তা কার্যকর হবে আর যদি বিপক্ষে হয় তাতে কোন আপত্তি নাই। এমতবস্থায় হযরত যায়েদ (রাঃ) ফতওয়া দিতে অস্বীকার করলে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় যায়েদ (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আমার ফতওয়াটা আমি আপনাকে মুখে না দিয়ে কাগজে লিখে দিব। অতএব হযরত যায়েদ (রাঃ) রীতিমত শাজরা তৈরী করে লিখিত আকারে ওয়ারিশদের অংশ ভাগ করে হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত জন সমক্ষে খুতবা দানের মাধ্যমে বলেন- হযরত যায়েদ বিন সাবিত আমাকে বিতর্কিত মাসয়ালাটি লিখিতভাবে জানিয়েছেন। আমি এর স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এর কার্যকারিতা ঘোষণা করছি।

## হাদীসের হিফাযত

কোরআন মজীদের জীবন্ত ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীসে রাসূল (সাঃ)-এর এ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে তার হিফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে অসীম ত্যাগ ও সাধনা এবং কঠোর সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার নযীর পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ রাসূল (সাঃ)-এর যুগে হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষণ কার্য শুরু হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতিশয় কষ্টের মাধ্যমে হাদীসের হিফাযতের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে কিরাম হাদীসের হিফাযত ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

## হাদীস হিফাযতের বিভিন্ন উপায়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষেণের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চারটি পন্থা অবলম্বন করে আসছেন। (১) হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থকরণ, (২) হাদীসের শিক্ষাদান, (৩) হাদীস মোতাবেক আমল, (৪) হাদীস লিপিবদ্ধকরণ।

## সাহাবা যুগে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্তকরণ-

হাদীসের প্রথম ধারক ও বাহক ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরামের মুবারক জামাত। তাঁরা প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর মুখে যা



শুনেছেন এবং যা দেখেছেন তার সবই সংরক্ষণ করে পরবর্তী উম্মতের কাছে আমানত রেখে চলে গেছেন। রাসূল (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বের সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল এক লাখের কাছাকাছি।

## হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা

হযরতের কাছ থেকে সরাসরিভাবে অথবা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ইমাম আবু জুরআ রাজীর মতে একলাখ চৌদ্দ হাজার। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় কেবল মক্কা ও মদীনায় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ইমাম শাফেয়ীর মতে ষাট হাজার। তন্মধ্যে প্রায় ১০ হাজার সাহাবীর জীবন ও কীর্তিকলাপের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত আছে। তাঁদের প্রত্যেকে কিছু না কিছু হাদীস পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কে কি পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন তারও একটি পরিসংখ্যান ইতিহাসে আছে। সাহাবায়ে কিরামের অনেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থকরণের জন্যে নিজেদের জীবনকে ওয়াক্ফ করে দিয়ে দিয়েছেন। যথা ঃ আসহাবে সুফ্ফা আর যাঁরা অন্যান্য দায়িত্বের দরুণ সর্বক্ষণ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির থাকতে পারতেন না তাঁরা যখনই সুযোগ পেতেন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার চেষ্টা করতেন বা অন্যের নিকট রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে কখন কি ঘটছে তা জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কেহ কেহ তো এর জন্যে অন্যের সাথে পালা ঠিক করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন–"আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী আত্বান ইবনে মালিক মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতাম। সুতরাং আমরা রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার জন্যে পালা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হতেন আর আমি একদিন হাযির হতাম। যে দিন আমি হাজির হতাম সে দিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁকে দিতাম এবং তিনি যে দিন হাযির হতেন সে দিন তিনি এরূপ করতেন।"

## আসহাবে সুফ্ফা

হাদীসের প্রথম ধারক হিসাবে হাদীসের ইতিহাসে আসহাবে সুফ্ফার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুফ্ফার অধিবাসীগণ দিন-রাত রাসূলের দরবারে পড়ে থাকতেন। এদের কোন ঘর সংসার ছিল না, আয়-উপার্জনের তেমন প্রয়োজনও ছিল না। তাই অন্যান্যদের তুলনায় তারা যে রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যে অধিক সময় লাগাতে সক্ষম হয়েছেন এতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। ফলে মসজিদে

নববী একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ছিলেন এর প্রধান উস্তাদ আর সাহাবীরা ছিলেন শিক্ষার্থী।

## হাদীস শিক্ষার জন্যে তাঁদের সফর

অনেক সময় অনেকে দূর দুরান্ত থেকে সফর করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আসতেন হাদীস শিক্ষার জন্যে। যেমন ইমাম বুখারী (রাঃ) হযরত উক্‌বা ইবনে হারিসের একটি ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত উক্‌বাকে এক মহিলা সংবাদ দিল যে, মহিলাটি তাঁকে এবং তার স্ত্রীকে দুগ্ধপান করিয়েছে। তখন হযরত উক্‌বা মক্কায় ছিলেন। কথাটি শোনার সাথে সাথে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি অজানা অবস্থায় নিজের দুগ্ধবোনকে বিবাহ করে ফেলে, পরে উভয়কে যে দুধপান করিয়েছিল সে মহিলা অবগত করিয়ে দেয়, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান কি? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, যখন মহিলাটি সাক্ষ্য দিল তখন কি করে সম্ভব? (অর্থাৎ এখন আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন থাকতে পারে না) একথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হল।

অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ) ইন্তেকালের পরেও সাহাবীদের অনেকে অপর সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করার জন্যে শত শত মাইল সফরের কষ্ট স্বীকার করতেন। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কেবল একটিমাত্র হাদীস শোনার জন্যে মদীনা থেকে এক মাসের পথ সুদূর সিরিয়ায় সফর করেছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) (মৃঃ-৫০ হিজরী) একটি হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্র করেছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইসের কাছ থেকে একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে এক মাসের পথ সফর করেছিলেন।

হযরত ফজালা ইবনে উবাইদের নিকট হাদীস জিজ্ঞাসা করার জন্যে হযরত আনাস (রাঃ) মিসর গমন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে বয়োবৃদ্ধ সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

সাহাবায়ে কিরামের হাদীস সংগ্রহ সংক্রান্ত আরও বহু চমকপ্রদ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে আছে।



## সাহাবীদের হাদীস মুখস্তকরণ

হাদীস হিফাযতের অন্যতম পন্থা হচ্ছে হাদীস কণ্ঠস্থ করা। সাহাবীগণ কোরআন মজীদের যে ভাবে হিফয ও আলোচনা করতেন সেভাবে হাদীসকেও তাঁরা নিজ নিজ সাধ্যমত মুখস্ত করে রাখতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন- আমরা রাসুল (সাঃ)-এর সময় হাদীস মুখস্ত করতাম। -(মুসলিম)

মহান আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবে স্মরনশক্তি সম্পন্ন আরব জাতীকেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত ও তাঁর বাণীর সংরক্ষণ হিসোবে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এসব হৃদয়কে কোরআনের আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর হাদীস মুখস্থ রাখার জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করেছিলেন।(আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন)

প্রসিদ্ধ তাবী হযরত কাতাবা ইবনে দেয়ামাহ দাবী করে বলেন:আল্লাহ এ জাতিকে (উম্মতে মুহাম্মদী কে) স্মরণশক্তির এমন প্রতিভা দান করেছেন যা অন্য কোন জাতিকে দান করা হয়নি। এটা এমন এক গুন যা কেবল তাদেরকেই দেয়া হয়েছে আর এটা এমন এক সম্মান ও মর্যাদা যার দ্বারা শুধু তাদেরকেই সম্মানিত করা হয়েছে। -(যুরকানী)

## হাদীস লিখার জন্যে সাহাবীদের প্রতি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ

সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক জাহিলিয়্যাতের যুগেই লিখা-পড়া জানতেন এবং অনেক যুবক সাহাবীই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁদের অনেকেই রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শ্রুত হাদীস ব্যক্তিগতভাবে লিখে রাখতে সমর্থ ছিলেন। রাসূল (সাঃ) প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে সকলকেই হাদীস লিখতে নিষেধ করে থাকলেও পরে এর জন্য সাধারণ অনুমতি দান করেছিলেন। বরঞ্চ সাহাবীদেরকে এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে থাকতেন। আবার এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা তিনি অপসারণও করে দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথাই হিফাযতের উদ্দেশ্যে লিখে নিতাম। তা দেখে কুরইশী সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তাঁরা বলেন-"তুমি রাসূল (সাঃ)-এর মুখে যা শুন, তা সবই কি লিখে রাখ? অথচ রাসূল (সাঃ) একজন মানুষ। কখনো সন্তোষ আর কখনো ক্রোধের মধ্যে কথা

বলেন” হযরত আবদুল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি হাদীস লিখা বন্ধ করে দিই এবং ব্যাপারটি রাসূল (সাঃ)-কে জানাই। তখন রাসূল (সাঃ) স্বীয় দু' ওষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বলেন–"তুমি লিখতে থাক। আল্লাহ্‌র শপথ, আমার এ মুখ থেকে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না। (সুনানে দারিমী)

এর পর হযরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন–হে রাসূল! আপনার কাছে যা কিছু শুনতে পাই তার সবই কি লিখে রাখব? রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। হযরত আবদুল্লাহ পুনারায় জিজ্ঞাসা করলেন–অর্থাৎ ক্রুদ্ধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় বলা সব কথাই কি লিখব, রাসূল (সাঃ) চূড়ান্তভাবে বললেন–'হ্যাঁ, সকল অবস্থায় আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিনা'।

উল্লেখিত এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে প্রথমতঃ রাসূল (সাঃ) ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর মুখ থেকে কখনও সত্যের বিপরীত কোন কথা বের হত না। দ্বিতীয়ঃ হাদীস লিখে রাখার কেবল অনুমতিই ছিল না, বরঞ্চ সব সময় ও সর্বাবস্থায় বলা সব কথাই লিখে রাখার জন্যে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট আদেশও দিয়েছিলেন। কারণ, রাসূল (সাঃ) ছিলেন সর্ব সাধারণ মুসলিমের জন্যে সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই অনুসরণীয়। তাঁর প্রত্যেকটি অবস্থাও সব সময়ের সকল কথা ও সকল প্রকার কাজই ইসলামী শরীয়তের উৎস।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–'ইলমে হাদীসকে বন্দী করে সংরক্ষিত কর', আমরা জিজ্ঞেস করলাম–তাকে কি করে বন্দী করব? রাসূল (সাঃ) বললেন–অর্থাৎ তাকে লিখে নাও। (মুস্তাদরাক)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–একজন আনসার সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে বসে তাঁর বাণী শুনতেন। তা তাঁর খুবই ভাল লাগত। কিন্তু তিনি ভালভাবে স্মরণ রাখতে পারতেন না। একদিন তাঁর এ অসুবিধার কথা রাসূল (সাঃ)-কে জানালে তিনি তাঁকে বলেন–অর্থাৎ তোমার ডান হাতের সাহায্য গ্রহণ কর। এ বলে রাসূল (সাঃ) হাত দ্বারা লিখার কথাই বুঝিয়ে ছিলেন। (তিরমিযী)

## সাহাবীদের যুগে লিখিত হাদীস অমূল্য সম্পদ

হাদীস লিখার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে দেখা যায় সর্বাগ্রে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–"রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে আমার অপেক্ষা অধিক কেহ হাদীস বর্ণনা



করেননি। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস অধিক বর্ণনা করেছেন। এর কারণ তিনি হাদীস লিখে রাখতেন আর আমি লিখে রাখতাম না। (বুখারী শরীফ)

## সুহুফে আবু হুরায়রা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রথম দিকে হাদীস লিখতেন না। শুধু স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু পরে তিনিও বিপুল সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল পাঁচ সহস্রাধিক। (মুস্তাদরাক হাকেম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এক শাগরিদ হাসান ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া জমরী একদিন তাঁকে একটি হাদীস মুখস্থ শোনান এবং বলেন, 'এটি আপনার কাছে শুনেছি', তখন হযরত আবু হুরায়রা বললেন–'আমার কাছে শুনে থাকলে তা অবশ্যই আমার কাছে লিপিবদ্ধ থাকবে', অতঃপর হাসানের হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর লিখিত হাদীসসমূহের এক বিরাট স্তুপ দেখিয়ে বললেন–তোমার বর্ণিত হাদীসটি এতে লিপিবদ্ধ আছে। হযরত হাসান বলেন–অর্থাৎ 'তিনি আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব দেখালেন। তথায় রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস লিখিত ছিল। (ফতহুল বারী)

প্রায় আটশত কিংবা ততোধিক সাহাবী ও তাবী হযরত আবু হুরায়রা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। (তাহজীবুত-তাহজীব)

'মুসনাদে আবু হুরায়রা' নামক গ্রন্থটি সাহাবীদের যুগেই সংকলিত হয়। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ)

## হযরত আনাস -এর সংকলন

হযরত আনাস (রাঃ) ও হাদীস লিখে রাখতেন। দশ বছর বয়স কালেই তিনি হাদীস লিখতেন ও পড়তেন। তাঁর পিতা তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতের জন্য পেশ করে বলেছিলেন–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ আমার পুত্র, লিখা জানা এক বালক। (উসদুল গাবা)

তিনি দশ বছর যাবত রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত করেছিলেন। যা কিছু রাসূলের মুখে শুনতেন তার সবই লিখে রাখতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন–"আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে হাদীস

বর্ণনা করার জন্য শক্ত করে ধরলে তিনি একটি চোঙ্গা বের করে বললেন–এ সব হাদীস আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং লিখে নেয়ার পর আবার তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

## হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদের সংকলন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হাদীসের এক সংকলন তৈরী করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ সংকলন তাঁর পুত্রদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান একটি হস্তলিখিত হাদীস সংকলন দেখিয়ে বলতেন–"আল্লাহ্‌র শপথ, এটি আব্বাজানের হস্তলিখিত হাদীস সংকলন।"

## হযরত সামুরা ইব্‌নে জুনদাব এর সংকলন

হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাঃ) ও হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, তাঁর ইন্তেকালের পর এ হাদীস গ্রন্থ মীরাসী সুত্রে তাঁর পুত্র সালমান লাভ করেন। আল্লামা ইবনে সীরীন বলেন–'সামুরার সংকলিত হাদীসগ্রন্থে ইলম সন্নিবেশিত আছে।' তাহজীবুত্-তাজীব)

## হযরত ইবনে আব্বাস এর সংকলন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেসব হাদীস শুনতে পেয়েছিলেন তা সবই গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছিলেন। তাফেয়ের কিছু লোক তাঁর কাছে শুনে এ পূর্ণ গ্রন্থটি নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (তিরমিযী শরীফ) তিনি চিঠি পত্র লিখেও হাদীস প্রচার করতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আক্‌যিয়া)

তিনি ইন্তেকালের সময় এক উট বোঝাই হাদীসগ্রন্থ রেখে গিয়েছিলেন। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ) তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র আলী বহু সংখ্যক হাদীস সংকলন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ) মুহাদ্দিস আল কাত্‌তানী হযরত আবু রাফের স্ত্রী সালমার একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে–'আমি ইবনে আব্বাসকে লিখার কিছু পাত্র নিয়ে তাতে আবুরাফে' থেকে রাসূল (সাঃ) কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছু লিখতে দেখিছি। (আত তারাতীবুল ইদারিয়্যা)

ইমাম মুসা ইবনে উক্‌বা বলেন–"আল্লাহ শপথ ইবনে আব্বাসের গোলাম কুরাইব আমাদের সম্মুখে ইবনে আব্বাসের লিখিত হাদীস গ্রন্থ সমূহের এক উষ্ট্র বোঝাই সম্পদ পেশ করে।" (তাবকাতে ইবনে সা'আদ)



## হযরত মুগীরা ইবনে শুবার সংকলন

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) কে তাঁর অনুরোধক্রমে বহু সংখ্যক হাদীস লিখে দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী শরীফ।

## মহিলা সাহাবীদের অবদান

পুরুষ সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় মহিলা সাহাবীগণও হাদীস সাধনায় অনেক আগে ছিলেন। রীতিমত তাঁরাও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিয়েছেন।

## হযরত আয়েশা (রাঃ)

এদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। প্রায় ২৮৬টি হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। শতাধিক সাহাবা, তাবীন তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শা'গরিদগণের মধ্যে ছিলেন উরওয়া ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আবদুল্লাহ ইবনে আমের, মসরুক ইবনুল আজদা, ইকরামা ও আলকামা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।

## হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

হযরত আয়েশার ন্যায় হযরত উম্মে সালমারও হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা হল ৩৭৮। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ, সুলাইমান ইবনে য়াসাব,, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনে জুবাইর ও তাঁর কন্যা হযরত যায়নাব প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ফতোওয়াও প্রদান করতেন। তাঁর অনেক ফতোওয়া সংগৃহীত আছে। হাফিয ইবনে কায়্যিম বলেন–তাঁর ফতোওয়াগুলো সংকলন করা হলে একটি পুস্তক তৈরী হয়ে যেত।

## হযরত হাফ্‌সা (রাঃ)

হযরত হাফ্‌সা থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## হযরত মায়মুনা (রাঃ)

হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে ৪৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়েদ ইবনে আসেম ও আতা ইবনে য়াসার প্রমুখ মুহাদ্দিগণ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

এ ছাড়া উম্মাহাতুল মুমেনীনদের অন্যরাও কম বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) থেকেও কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আবার সাধারণ মহিলা সাহাবীরাও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান ও বর্ণনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। যে সকল মহিলা সাহাবী একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁদের সংখ্যা ১৩০ বলেছেন। অনেক গ্রন্থাকারের মতে এদের সংখ্যা ছিল ৫০০ শত। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ হযরত আসমা বিনতে উমাইস। তিনি ১৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর। তিনি ৫৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক সাহাবায়ে কিরাম এ দু'জনের কাছে হাদীস শিক্ষা করতেন।

হযরত উম্মেহানী ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উম্মুল ফযল থেকে ৩০টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ ছাড়া আরও অনেক মহিলা সাহাবী আছেন, যাদের অবদান হাদীসের ব্যাপারে চির স্মরণীয় থাকবেন।

## সাহাবা যুগে হাদীস পর্যালোচনা ও শিক্ষাদান

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর কাছে হাদীস শ্রবণ করে আসার সময় সুযোগ ও প্রয়োজন মতে একত্র হয়ে বসতেন এবং পারস্পরিক চর্চা ও আলোচনায় লিপ্ত হতেন। কোন কোন সময় তাঁরা হাদীস আলোচনার জন্যে বিশেষ বৈঠকের অনুষ্ঠান করতেন। সাধারণতঃ মসজিদে নব্বীতে এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। আবার কখনো তাঁদের বাড়ীতেও অনুরূপ বৈঠক বসত। এ সকল বৈঠক এর আলোচ্য বিষয় থাকত রাসূল (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও উপদেশাবলী। এতে করে তাঁদের কারো পূর্বে কোন বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারত আর কারো কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকলে তারও নিরসন হয়ে যেত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-"আমরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে হাদীস শ্রবণ করতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, তখন আমরা বসে শ্রুত হাদীসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি করতাম, চর্চা





করত, পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ রকমের প্রায় বৈঠকেই অন্ততঃ ষাট সত্তরজন লোক অবশ্যই উপস্থিত থাকত। এ বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকের সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত।" (মাজমাউ-জাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন-একদিন রাসূল (সাঃ) তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং মসজিদে দু'টি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। একটিতে সমবেত লোকেরা কোরআন পাঠ করছিল ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনায় মগ্ন ছিল। আর অপরটির লোকেরা হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে ছিল ও শিক্ষাদান করেছিল। রাসূল (সাঃ) বললেন, উভয় সমাবেশের লোকেরা কল্যাণের কাজ করছে। এরা কোরআন পাঠ করছে ও আল্লাহ্‌কে ডাকছে। আল্লাহ্ চাইলে তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করবেন, আর না চাইলে দিবেন না। আর অপর দলের লোক জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষা করছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে। আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন' "অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে বসে পড়লেন।" (দারিমী)

হযরত মুবাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন-"আমি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তাঁরা বললেন, আমরা ফরয নামায পড়েছি অতঃপর বসে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করছি।" (মুসতাদরাকে হাকীম)

## সাহাবীদের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন

কোরআন হাদীসের শিক্ষাদানের জন্যে সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মদীনা শরীফে নয়টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়া হত, তেমনি প্রত্যেকটিতে দ্বীনে ইসলাম শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা ছিল। (উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু)

আবদুল কায়স গোত্রের আগত প্রতিনিধি দল প্রত্যাবর্তন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, আনসারগণ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

ইবনে সাআ'দ বলেন, ফরহাদ ইবনে মালিক (রাঃ) ইয়েমেন থেকে আগমন করেন এবং কোরআন ইসলামের ফরযসমূহ ও শরীয়তের বিধান শিক্ষা করেন।" (তাবকাত ইবনে সায়াদ)